সি. ভি. রামন
এবং
রামন প্রভাব

জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা

সি. ভি. রামন
এবং
রামন প্রভাব

জি. এইচ. কেশবানী

অনুবাদ

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ভূমিকা

সি. ভি. রামনের উপর লেখা এই বইটি সঠিক অর্থে জীবনী নয় বা রামনের কাজের পর্যালোচনাও নয়। ছোট ছোট প্রবন্ধে রামনের জীবন ও গবেষণার কথা দিয়ে বইটি সাজানো হয়েছে।

এতে ভৌত ধারণাগুলির বর্ণনা অতি সরলীকরণ করা হয়নি। অনেক ধারণাকে বরং সহজ করে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সারমর্মকে ধরে রাখা হয়েছে। পৃথিবীতে বিজ্ঞানীর সংখ্যা এখন অনেক, কিছু কিছু বিজ্ঞান লেখক এখন এই বিজ্ঞানী সম্প্রদায়কে উদ্দীপ্ত করার জন্য উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে পারেন। তবে বিজ্ঞানে পাঠককে উৎসাহী করার জন্য বিভ্রান্তিকর উপমা ব্যবহার করে এডিংটন বা জীনস যেসব সরল বিজ্ঞানের রচনা করতেন সে রকম এটা রচনা নয়। জনপ্রিয় সহজ বিজ্ঞানের যতটা প্রয়োজন ততটাই। গণিত, পদার্থবিদ্যা বা দর্শন বিষয়ের গবেষণায় রামনের অবদান যে ভারতীয় মণীষার উৎকর্ষের নিদর্শন তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এখন মিলেছে। রামনের শিক্ষা পুরোপুরি ভারতবর্ষে এবং সবই শিখেছেন নিজের চেষ্টায়। তীক্ষ্ণ অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে পদার্থবিদ্যার সমস্যাগুলির মূলে তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন। পরীক্ষামূলক গবেষণায় ফ্যারাডে, ফ্রনহোফার, হেলমহোলৎজ এবং র‍্যালে যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেন রামন তার উত্তরসূরী। বস্তুত তিনি র‍্যালেকেই তার গুরু মনে করতেন, যদিও র‍্যালের কাছে কখনও তিনি কাজ করেন নি।

অধ্যাপনায় রামনের খ্যাতি ছিল এবং ছাত্ররা তাঁকে খুবই ভালবাসতো। কিন্তু 'রামন প্রভাব' আবিষ্কারের ক্ষেত্রে রামন কে. এস. কৃষ্ণানকে আর একটু বেশী কৃতিত্ব দিতে পারতেন কারণ ঐ আবিষ্কারে কৃষ্ণানের অবদান কিছু কম ছিল না।* অবশ্য এটা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে রামনের অবদান কম ছিল বা তাঁর অন্য কোন অবদান ছিল না। এদের কার অবদান কতটুকু সে বিষয়েও এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, রামন ও তাঁর কাজের বিষয়ে ছোট ছোট প্রবন্ধ নিয়ে গ্রথিত হয়েছে এই বইটি। প্রবন্ধগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ হলেও এদের পারস্পর্য আছে। আজকের দিনে পড়ার বিষয় এত বেশি যে ছোট ছোট প্রবন্ধই লোকে পছন্দ করেন তবে এতে কিছুটা পুনরাবৃত্তি হয়। এ ধরনের বইএর সুবিধা হল যে পাঠক মাঝে কোনখানে পড়া বন্ধ করলেও তাতে ধারাবাহিকতা ছিন্ন হওয়ার জন্য অসন্তোষ বোধ করবেন না। আশা করব, বহু সংখ্যক বিজ্ঞানীই বইটি শেষ পর্যন্ত পড়তে আগ্রহী হবেন।

জি. এইচ. কেশবানী

---

* এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় (viii খণ্ড, মাইক্রোপেডিয়া, 1976, পৃ402) রামন ও কৃষ্ণানকে যুগ্মভাবে কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : "প্রতীত ব্যাপারটির নামকরণ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের নামে। আর ভারতীয় একজন বিজ্ঞানী কে. এস. কৃষ্ণানের সঙ্গে যুগ্মভাবে 1928 সালে প্রভাবটি আবিষ্কার করেন।"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

টাটা ইনস্টিটিউটের ডঃ দুর্গা প্রসাদ এবং ডঃ ভি. এস. ভেঙ্কটবর্ধন 11 থেকে 21 অধ্যায় এবং পরিশিষ্ট I পড়ে মতামত দিয়েছেন।

ডঃ রাজা রামান্না 17 থেকে 21 অধ্যায় পড়ে দিয়েছেন।

দিল্লির ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক পি. কে. সি. পিল্লাই দৃষ্টির শারীরতত্ত্ব বিষয়ে 17 অধ্যায় পড়ে দিয়েছেন।

অধ্যাপক সি. ভি. রামনের একজন ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী অধ্যাপক আর. এস. কৃষ্ণান 17, 20 এবং 21 অধ্যায় শুনেছেন এবং রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান এদের দুজনের কার অবদান কত সে বিষয়ে মতামত দিয়েছেন।

দিল্লির ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির ডঃ কে. পি. জৈন রামন প্রভাবের তত্ত্ব এবং 18 অধ্যায়ে বর্ণিত লেসার রামন বর্ণালিবিদ্যা বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ন্যাশনাল ফিজিকাল ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর ডঃ এ. আর. ভার্মা 20 অধ্যায়ের জন্য অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন।

রামন সম্পর্কে টেক্সাসের অস্টিনস্থিত সেণ্টার ফর পার্টিকল থিওরির ডিরেক্টর অধ্যাপক ই. সি. জি. সুদর্শন কিছু মতামত জানিয়েছেন।

এদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার বিষয়ে খবর লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি দিয়েছেন। (ব্যাপারটা এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি)।

কয়েকজন তরুণ পদার্থবিদ মূল পাণ্ডুলিপিটি পড়েছেন। তাদের মন্তব্য আমার বক্তব্যের এবং সিদ্ধান্তগুলির যথার্থ্য প্রমাণের কষ্ঠিপাথর হিসেবে কাজ করেছে।

কিন্তু মতামতগুলি এবং তার দায়দায়িত্ব অবশ্যই আমার নিজের।

জি. এইচ. কেশবানী

অনুবাদকের নিবেদন

নামের বানান রমন না রামন এই নিয়ে বিতর্ক চলছে। বিজ্ঞান রচনায় শুদ্ধ বানান ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন শ্রদ্ধেয় পরিমল গোস্বামী। তিনি নিঃসন্দেহ হবার জন্য অধ্যাপকের কাছে চিঠি লেখেন। বাঙ্গালোর থেকে জবাবে অধ্যাপক দেবনাগরি হরফে লিখে জানান "রামন"। অনুবাদক নিজে ঐ চিঠি দেখেছেন। বইটিতে রামন ব্যবহার করা হয়েছে।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টিকর্তা

নেপোলিয়ন একবার লাপ্লাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কেন তিনি তার আকাশ-সংক্রান্ত বলবিদ্যার (সিলেসটিয়াল মেকানিকস) কোথাও একবারও সৃষ্টিকর্তা ভগবানের নাম করেন নি।* লাপ্লাস উত্তরে বলেছিলেন, কোনখানেই এই অনুমানের (হাইপথিসিস) প্রয়োজন হয়নি। মনে হয়, এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও তার ব্যাখ্যায় এই অনুমানের দরকার হয়নি। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আরও এক ধরনের আশ্চর্য প্রভাব দেখা গেছে। প্রসার যত বাড়ে নতুন দিগন্ত ততই আগের থেকে আরও বিস্তৃত হয়। বিজ্ঞানের এই বিস্তৃতি ও প্রকৃতি বিজয়-এর কি কোনদিন শেষ আছে? উত্তর দেবার পক্ষে অবশ্য প্রশ্নটি দুরূহ, কারণ 'কোন দিন' বললে সঠিক উক্তি হয় না। তবে মানুষ যেদিন প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে জানতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে একমাত্র তখনই সে সৃষ্টিকর্তার সমতুল্য হবে। শুধু এইটুকুই বলা যায়, অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানই সর্বজনস্বীকৃত ও আসল সৃষ্টিকর্তার অধিকারের দায়িত্ব গ্রহণ করছে। তাই বিজ্ঞানের সাধনা মানুষের সৃষ্টিকর্তার কাছাকাছি পৌঁছবার একটি দরজা মাত্র। চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামনের[1] এটা ছিল মূলমন্ত্র। তিনি বিশ্বাস করতেন "জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে তার কাছে ভগবানের স্বরূপ প্রতিনিয়তই উদঘাটিত হচ্ছে।" এটাই ভারতীয় চিন্তাধারার ঐতিহ্য। সৃষ্টিকর্তার কাছে পৌঁছতে এর সঙ্গে রামন যোগ করেছিলেন বিজ্ঞানের প্রতি অনুপ্রাণিত নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত উদ্যম।

আরও অনেকের মত সি. পি. স্নো[2] মাঝে মাঝেই উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, বিজ্ঞানীদের এই উদ্যম পুরোপুরি তাত্ত্বিক।

বলা হয়ে থাকে যে, কৃষ্টির আর একটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী জগত আছে—ব্যবহারিক জগত, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রের জগত। রামনও[3] তা মনে করতেন না। তিনি বলেন, "প্রকৃতির বর্ণনায় বিজ্ঞান মানুষের সৌন্দর্যবোধ ও মননশক্তির সংযোজন। সৃজনধর্মী কলায়

---

* পণ্ডিত বেত্তা লাগরাঞ্জ এই শুনে বলেন, 'হাঁ, কিন্তু কি অপরূপ সুন্দর এই অনুমান।'

[1] এ. কে. চক্রবর্তী : *ডিকশেনারি অফ ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি,* তৃতীয় খণ্ড। ইনস্টিটিউট অফ হিস্টোরিকাল স্টাডিস, 1974।

[2] সি. পি. স্নো : *দি টু কালচারস, নিউ স্টেটসম্যান,* অক্টোবর 6, 1956; 1959 সালের রীড বক্তৃতা।

[3] সি. ভি. রামন : *দি নিউ ফিজিক্স,* ফিলজফিকাল লাইব্রেরী, নিউ ইয়র্ক, 1951, পৃ: 141।

এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ।" পদার্থবিদ্যার নানান ভাগ থেকে নিজে গবেষণার যে বিষয়গুলি তিনি বেছে নিয়েছিলেন তার থেকেই তাঁর অভিমত বোঝা যায়। তাঁর প্রধান আগ্রহ ছিল শব্দ ও বাদ্যযন্ত্র বিষয়ে গবেষণা, তারপর সারাজীবন আলো আর দৃষ্টি নিয়েই কাজ করলেন। এই শতাব্দীর বিশ দশকের শেষ দিকে কাজ করেন চুম্বকত্ব এবং চুম্বকীয় আলোকতত্ত্ব নিয়ে। আবার শেষ জীবনে তিনি আগ্রহী হন মণি, জহরত ও কেলাসের ধর্ম নিরূপণে। ফুলের এবং মণি মানিক্যের রং চিরকালই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, তাদের সৌন্দর্য ও আকৃতির জন্য। 1941 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সয়াজী রাও গায়কোয়াড় ফাউণ্ডেশান বক্তৃতায়[4] শুভ্র জ্যোর্তিময় মণি উপল সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন:

> বহুমূল্য উপল অদ্ভুত রঙে খেলা দেখায়। কোন কোনটি নানা রঙের অসংখ্য চুম্‌কি ছড়ায় আবার কতকগুলি থেকে রামধনু রঙে অবিচ্ছিন্ন দীপ্তি বেরোয়। ...উপলগুলির সাধারণত প্রতিফলিত রংগুলি ছাড়াও একটা নিজস্ব নীলাভ দীপ্তি থাকে। এই দীপ্তি যদি তীব্র হয় তবে এর ভেতর দিয়ে যে আলো যায় তার রং হয় মধুর মত হলদেটে, পরিপূরক রংগুলি তখন আর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

অথবা গাছের পাতা এবং ফুলের রং নিয়ে লেখা[5] অংশটি দেখা যাক:

> ফুল হয় এমন আর একটি চমৎকার গাছ 'জাকারান্দা মিমেসিফোলিয়া'। এর পাতার বাহার ফুলের সমারোহকে ছাপিয়ে যায়। ফুলও হয় অজস্র। দূর থেকে দেখলে মনে হবে নীল কুয়াশায় ঢাকা। বর্ণালী বিশ্লেষণে দেখা যায়.......

রচনাগুলির বর্ণনা মনে করিয়ে দেয় টার্নারের আঁকা নিসর্গ দৃশ্য।

রামন ছিলেন সহজাত দার্শনিক ও শব্দ ও আলোর (son et lumiere) বৈজ্ঞানিক। নিউটন, ইয়ং, হেলমহোলৎজ এবং র‍্যালের ঐতিহ্যের অধিকারী।

পদার্থ বিদ্যার পরীক্ষামূলক গবেষণার নৈপুণ্যে দেশের মধ্যে একমাত্র জগদীশ চন্দ্র বসুই তাঁর সমতুল্য ছিলেন। তা ছাড়া, তিনি গবেষণা পরিচালনায় দক্ষ অনেক বিজ্ঞানী সৃষ্টি করেও দেশে পরীক্ষামূলক গবেষণার ধারা সৃষ্টি করে গেছেন। 1921 থেকে 1960 পর্যন্ত রামন ও তার সহকর্মী বর্ণালিবিজ্ঞানীরা পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানে সব থেকে সক্রিয় ভূমিকা নেন। অনেকটা উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান বর্ণালিবিজ্ঞানী ফ্রনহোফার, বুনসেন ও কির্শফের মহান প্রথায়। 360 টি প্রবন্ধ ও চারটি বই জুড়ে তাঁর কাজের বিস্তৃতি। যদিও সব কাজগুলির মান অসম, তবু তার কাজের অসংখ্য ধারার বৈচিত্র্য কালের প্রভাবে ম্লান হবে না।

আলোর যে প্রভাবের সঙ্গে রামনের নাম যুক্ত, তার আবিষ্কার আরও অনন্য। মনে রাখতে হবে রামন কাজ করতেন নিজে এবং তাঁর সময় পরীক্ষামূলক গবেষণার উপযোগী কোন সাজ সরঞ্জাম ছিল না। বিমূর্ত ভবিষ্যৎদর্শনে ধ্যানমগ্ন এক ভারতীয় এ তত্ত্ব, ও তত্ত্ব

---

[4] সি. ভি. রামন : *লেকচারস ইন ফিজিকাল অপটিকস,* দি ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেস, বাঙ্গালোর, 1959, পৃ: 42।

[5] সি. ভি. রামন : *দি ফিজিওলজি অফ ভিসন,* দি ইণ্ডিয়ান একাডেমী অফ সায়েন্সেস, 1968, পৃ: 145।

নিয়ে নাড়া চাড়া করছেন—এ এমন নয়। বরং বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র হাতে এক ব্রাহ্মণ প্রকৃতির এক নতুন প্রপঞ্চ দেখছেন, যতক্ষণ না কবি শেলীর ভাষায়—একটি নতুন সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে ঝলসে উঠল। একটি প্রপঞ্চ আবিষ্কৃত, নির্ভুলভাবে চিহ্নিত এবং তার প্রকৃত ধর্ম জানার পরই সাধারণের কাছে তার সারল্য উন্মুক্ত হয় এবং তখন মনে হয় সত্যিই এ তো হবারই কথা! ভিন্ন ভিন্ন ভৌত মডেল ও তার সম্ভাব্য তত্ত্বীয় প্রভাব সাধারণত একাধিক হয়। প্রত্যেকটি নতুন প্রপঞ্চকে ঘিরে থাকে নানান ধরনের অপ্রাসঙ্গিকতা, যেগুলি সহজে দূর করা যায় না। পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা একটি বিভ্রান্তিকর সূত্রে ভরা যাদুময় কল্পনা রাজ্য এবং কেবলমাত্র অভিজ্ঞ গুরুর দৃষ্টিই সেখানে পথ খুঁজে দিতে পারে। ফ্যারাডে একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, এক্সপেরিমেণ্ট সায়রে ছিপ ফেললে মাছ উঠতে পারে আবার আগাছাও উঠতে পারে।

তখন যেসব যন্ত্রপাতি পাওয়া যেত, তা দিয়ে অতি ক্ষীণ এই প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে ডাহা শারীরিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রয়োজন, অধিকাংশ গবেষকই সে কাজ করতে চাইতেন না। দীর্ঘ সাত বছর ধরে রামন ও তার সহকর্মীরা এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন।

রামন প্রভাব কত ক্ষীণ তা বোঝা যাবে এই তথ্য থেকে যে, তার তীব্রতা আপাতত কিরণপুঞ্জের তীব্রতার তুলনায় একলক্ষগুণ কম এবং বিক্ষিপ্ত আলোও এর থেকে বেশি তীব্র।

আরও একটি কারণে রামনের আবিষ্কার সমসাময়িক পরীক্ষামূলক কাজে লিপ্ত পদার্থবিদদের থেকে বিশিষ্ট। তাঁর পরীক্ষায় ব্যবহৃত যন্ত্র ছিল অতি সাধারণ এবং সেসবের অনেকগুলো তাঁর নিজে হাতে গড়া বা সংযোজিত করা। তিনি অনেক সময় বলতেন, তাঁর প্রধান কাজে খরচ হয়েছিল 200 টাকা (কুড়ি পাউণ্ড) একটি পকেট বর্ণালিবীক্ষণ আর একটি মার্কারি ল্যাম্প। এটাকে রামন বলতেন আলাদীনের প্রদীপ—এটাই আবিষ্কারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বস্তুতপক্ষে আবিষ্কার প্রথম হয় সূর্যরশ্মি ব্যবহার করে। মার্কারি ল্যাম্প আসে পরে। রামনের আবিষ্কার রঞ্জন রশ্মিকে কম্পটন প্রভাব এবং মোসবাওয়ার প্রভাবের সঙ্গে একসারিতে ফেলা যায়। রঞ্জন রশ্মির প্রয়োগের ক্ষেত্র অন্য দুটির তুলনায় অনেক বেশি। হিব্বেনের[6] হিসাব মত 1928 সালে আবিষ্কারের পরবর্তী দশ বছরে 2000 গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। 1970 সালে রামনের মৃত্যুর সময় আর. এস. কৃষ্ণান[7] লেখেন যে, সেই পর্যন্ত 10,000 পেপার ছাপা হয়েছে। শুসচিনস্কির[8] হিসেবে 8,000।

---

[6] জে. এইচ. হিব্বন, *দি রামন এফেক্ট এণ্ড ইটস কেমিক্যাল এপ্লিকেশনস,* রাইন হোল্ড পাবলিকেশন কর্পোরেশন, নিউ ইয়র্ক, 1939, পৃ: 7।

[7] আর. এস. কৃষ্ণান, *জার্নাল অফ সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ,* নিউ দিল্লী, 30, 4 (1971)।

[8] এম. এম. শুসচিনস্কি, *রামন স্পেকট্রা অফ মলিকিউলস এণ্ড কৃস্টালস,* ইজরায়েল প্রোগ্রাম অফ সায়েণ্টিফিক ট্রানস্লেশানস, লণ্ডন, 1972।

প্রকৃত পক্ষে আলোর উৎস হিসেবে লেসার রশ্মি আবিষ্কারের পর, রামন বর্ণালি বিশ্লেষণ ও তার প্রয়োগের পুনর্জন্ম হয়েছে। লেসার রশ্মি উচ্চমাত্রায় একবর্ণী, কলা-সম্বদ্ধ এবং অতি তীব্র এবং তাই রামন-প্রভাব দেখার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। হিসেবে জানা যায় যে, এ পর্যন্ত রামন-প্রভাবের ওপর 12,000 পেপার লেখা হয়েছে।

সুতরাং ম্যাক্স বর্নের[৭] "প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে রামন-প্রভাব কোন বৈপ্লবিক আবিষ্কার নয়....কিন্তু এমন একটি প্রভাব যা কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে আগে থেকেই জানা ছিল" এমন উক্তিটি ঠিক নয়। রামন-বর্নের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। রামন-প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় এর মৌলিকত্ব এবং পদার্থবিদ্যায় এর শক্তিশালী ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যাবে।

[৭] ম্যাক্স বর্ন, *অ্যাটমিক ফিজিক্স,* ব্লাকি এণ্ড সন, লণ্ডন 1946, পৃ: 258।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রামনের পূর্বসূরীরা

সময় 1666। বন্ধ অন্ধকার ঘরে ফুটোর মধ্যে দিয়ে আসা সূর্যরশ্মির সামনে একটি প্রিজম বসিয়ে নিউটন 25 সে মি লম্বা বিশুদ্ধ বর্ণালি দেখেন। ঐতিহাসিক যথাযথতা বজায় রাখতে বলতে হয়, এর আগে 1640 সালে প্রাগের এম. মার্সি অনুরূপ প্রিজম ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন প্রিজমের মধ্যে রং তৈরী হচ্ছে—প্রিজম যে রংগুলি পৃথক করছে তা বুঝতে পারেন নি। নিউটন যদি একটি রেখা ছিদ্র (স্লিট) প্রিজমের সামনে রাখতেন, তাহলে সাদা আলোর জন্য রংগুলি ক্রমবিন্যাসে তো পেতেনই তা ছাড়া অবিচ্ছিন্ন বর্ণালির ওপর কালো কালো অবশোষণ রেখা দেখতে পেতেন। আলোর গতি পথে যে সব বস্তু পড়ে তারা আলোর খানিকটা শক্তি শুষে নেয়। অবশোষণ রেখাগুলি তাদের বৈশিষ্ট্যমূলক চিহ্ন। 1802 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ওলাস্টোন[1] প্রথম সূর্যের বর্ণালিতে সাতটি কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখেন, কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কারকে কাজে লাগাতে পারেন নি। সূর্যের বর্ণালিতে কৃষ্ণবর্ণ অবশোষণ রেখার উপস্থিতি ও তার ব্যাখ্যা দেন ফ্রনহোফার[2] 1817 সালে। তিনি এও দেখান যে কৃষ্ণ রেখাগুলির বর্ণালিতে নির্দিষ্ট স্থান আছে। ক্রমশ জানা গেল, সূর্য থেকে আসার পথে অন্তবর্তী স্থানে যে সব বস্তু বিকিরণ শোষণ করে কৃষ্ণ রেখাগুলি তাদেরই অনুসারী। ফ্রনহোফার এদের নামকরণ করেন A, a, B (লাল), C, D, b, E, F, G, H (বেগুনী) এবং I—এগুলিই সবার আগে নজরে আসে। সৌর বর্ণালিতে তিনি প্রায় 574টি কৃষ্ণ অবশোষণ রেখা পেয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি সৌর বর্ণালির বিভিন্ন রং দেখার ক্ষেত্রে চোখের আপেক্ষিক সুগ্রাহিতাও মেপেছিলেন।

এ বিষয়ে রামন পরে নিজেও কাজ করেছিলেন। ল্যাবরেটরিতে আলোর বিকিরণ অপেক্ষাকৃত শীতল বাষ্পের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় ঐ বাষ্প নির্দিষ্ট কম্পাংকের বিকিরণ শোষণ করে, তাই অপর প্রান্তে বর্ণালিতে ঐ বাষ্পের মধ্যের বস্তুগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক রেখাগুলি কৃষ্ণ রেখা হয়ে দেখা দেয়। যদি মূল উৎস ও পর্যবেক্ষকের অন্তবর্তী মৌলগুলি উৎস থেকে অধিকতর তাপমাত্রায় থাকে, তা হলে তার থেকে নিঃসৃত আলোর বর্ণালি রেখা উৎসের রেখার সঙ্গে মিলে বর্ধিত হয়ে বর্ণালিতে উজ্জ্বল রেখা হয়ে ফুটে উঠবে। সব মৌল

---

[1] ডব্লু. এইচ. ওলাস্টন : *ফিলসফিকাল ট্রান্সাকসান অফ দি রয়াল সোসাইটি*, লণ্ডন, II, 365 (1802)।

[2] জে. প্রনহোফার, মিউনিখ, 6, 193 (1817)।

থেকে একাধিক রেখা নিঃসৃত হয় অর্থাৎ একাধিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যে এবং সবগুলিই শোষিত হতে পারে। একটি প্রিজম ও একটি টেলিস্কোপ (দুটি মিলে স্পেকট্রোস্কোপ বা বর্ণালিবীক্ষণ) ব্যবহার করে আগুনের শিখায় বা জ্বলন্ত বস্তুর মধ্যে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ মৌলদেরও অস্তিত্ব ধরা যায়।

1859 সালে বুনসেন ও কির্শফ সাধারণ লবণ বিভিন্ন তাপমাত্রার অগ্নিশিখায় ধরে তার ওপর দিয়ে সূর্যের আলো পাঠিয়ে দেখান যে উচ্চতাপ মাত্রায় বিয়োজিত সোডিয়াম যখন সূর্যের সোডিয়ামের (যার থেকে D-রেখার উৎপত্তি) চেয়ে অধিকতর তাপে ওঠে তখনই রেখাগুলি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আবার অগ্নিশিখার তাপমাত্রা যখন কম থাকে তখন সূর্যরশ্মি থেকে সোডিয়াম পরমাণুগুলি আলো শোষণ করে এবং বর্ণালীতে রেখাগুলি কৃষ্ণতর হয়ে ওঠে। সূর্যের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন তাপমাত্রায় যে সব মৌল দিয়ে সৌর দেহগঠিত বর্ণালিতে তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করে চিত্র তৈরি করেন। তাদের বর্ণালি চিত্রটি 2.5 মি. লম্বা—লম্বায় নিউটনের চিত্রের দশগুণ। ইংরেজ বিজ্ঞানী হাগিনস 1864 সালে দূরস্থিত নীহারিকার বর্ণালি দেখে প্রমাণ করতে পারেন যে সেগুলো জ্বলন্ত গ্যাস পিণ্ড—তারার সমষ্টি নয়। বর্ণালিবীক্ষণ ব্যবহার করে কির্শফ ও বুনসেন 1861 সালে রুবিডিয়ম ও সিজিয়ম নামে দুই মৌলের আবিষ্কার করেন। 1868 সালে সুইডেনবাসী বিজ্ঞানী অ্যাংস্ট্রম অসীম অধ্যবসায়ে 1200টি রেখার স্থান নির্দিষ্ট করেন। তিনি এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও নিরূপণ করেন। তাঁরই নামে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাপার একক অ্যাংস্ট্রম, (এক অ্যাংস্ট্রম=10^{-8} সেমি)। 1868 সালে লকইয়ার সূর্যদেহে আবিষ্কার করেন হিলিয়ম মৌলটি (হাইড্রোজেন বোমায় হাইড্রোজেন হয়ে সংযোজিত হয়ে যা উৎপাদিত হয়)। এটা পৃথিবীতে হিলিয়ম আবিষ্কারের অনেক আগে। দার্শনিক কঁতের ভবিষ্যদ্বাণী, "কোন্ কোন্ রাসায়নিক উপদানে জ্যোতিষ্করা গঠিত এরকম কিছু কিছু বিষয়ের কথা মনুষ্যজাতি কোন দিনই জানিতে পারিবে না"—ভুল বলে প্রমাণিত হল। এখন জানা গেছে, সূর্যে 66টি মৌল বর্তমান। বহুদূরে অবস্থিত গ্যালাক্সিদের এবং তাদের অন্তবর্তী দেশে যে সামান্য বস্তুকণা আছে তাদের সম্বন্ধেও অনুরূপ খবর জানা গেছে। ফটো তোলা চলন হওয়ার পর সূর্যের বর্ণালি এবং পৃথিবী পৃষ্ঠের নানা ধরনের উত্তপ্ত বস্তুর বর্ণালির ছবি নেওয়া হতে থাকে। সৌর বর্ণালিতে ফ্রনহোফার রেখার ফটোগ্রাফ প্রথম তোলেন নিউ ইয়র্কের জে. ডব্লু. ড্রেপার 1842 সালে।

এতক্ষণ বর্ণালিবিজ্ঞান ও বর্ণালিবীক্ষণ নিয়ে যে আলোচনা করা হল তা, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণ রামন তার আবিষ্কার করতে বর্ণালিবীক্ষণ ব্যবহার করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আলোর ভৌত ধর্ম এবং কিছু কিছু প্রতীক চিহ্ন জেনে নিলে সুবিধে হবে। আলোর তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের গতিবেগ বায়ুশূন্যস্থানে (ভ্যাকুয়মে) প্রতিসেকেণ্ডে 3×10^{10} সেমি। তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণে থাকে তড়িৎ ও তার সঙ্গে চুম্বকীয় তরঙ্গ—যা উত্তেজিত বস্তুর মধ্যের তড়িৎকণা থেকে যুগপৎ উৎপন্ন হয়। গরম করার প্রক্রিয়া যখন চলতে থাকে,

পরমাণুর মধ্যের ইলেকট্রনগুলি তখন উত্তেজিত হয় এবং স্থিতি বজায় রাখার জন্য যত শক্তি প্রয়োজন তার বাড়তি শক্তি বিকিরণ আকারে নিঃসরণ করে। আলোর উৎসগুলি থেকে যে তড়িৎ ও চুম্বক ক্ষেত্র চলে তার তীব্রতা অতি অল্প। চুম্বক ক্ষেত্রের কথা উপেক্ষা করা যেতে পারে কারণ বস্তুদের তড়িৎকণাদের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ায় তড়িতের প্রভাব অনেক বেশী। আলো যে আমাদের সাধারণ জীবনে তড়িৎ তরঙ্গ তা বোঝা যায় না কারণ আমরা কখনও তড়িতের উপস্থিতি অনুভব করি না, তা আলো যতই তীব্র হোক না কেন। এর কারণ তড়িৎ ক্ষেত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। তত্ত্বের সাহায্যে ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করেন যে আলো তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। উনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানে সেটাই শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী।

আমরা বলেছি যে, তড়িৎ ক্ষেত্র তরঙ্গাকারে চলে। কিন্তু তরঙ্গ নানা রকমের হয়। আলোর বেলায় বলা চলে একটি দড়ির একপ্রান্ত ধরে ঠিক ভাবে নাড়ালে যে ধরনের ঢেউ তোলা যায়। এই তরঙ্গ সেরকম, দড়িতে যে ধরনের ঢেউ হয়, তার নাম অনুপ্রস্থ তরঙ্গ অর্থাৎ তরঙ্গের প্রভাব গতিপথের সমকোণে থাকে। কিন্তু শব্দের সংনমন তরঙ্গ অনুদৈর্ঘ্য। অনুপ্রস্থ বা অনুদৈর্ঘ্য যে কোন সমতাল তরঙ্গের তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে।

বিস্তারণ বেগ = c (আলোর জন্য ভ্যাকুয়মে প্রতি সেকেণ্ডে 3×10^{10} সে.মি.)
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য = λ, ধরা যাক সে.মি. এককে
কম্পাংক = ν প্রতি সেকেণ্ডে
প্রতি সেকেণ্ডে ν সংখ্যক λ দৈর্ঘের তরঙ্গ বিস্তারিত হয়।
অতএব $c = \lambda\nu$
অথবা $\lambda = c/\nu$ এবং $\nu = c/\lambda$

এই ধারণাগুলি পরিশিষ্ট এক-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দৃশ্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতি ক্ষুদ্র, একথা আগেই বলা হয়েছে। এর মাপের একক অ্যাংস্ট্রম (Å) 10^{-8} সে.মি.। তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের যে অংশ চোখে দেখা যায় তার বিস্তৃতি 3800 Å থেকে 7600 Å পর্যন্ত। তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিপরীতকে বলে তরঙ্গ-সংখ্যা। দৃশ্য আলোর ক্ষেত্রে তরঙ্গ-সংখ্যার বিস্তৃতি আনুমানিক $10^8/3800=25,750$ থেকে $10^8/7600=13,150$ পর্যন্ত। তরঙ্গ-সংখ্যার মাত্রা দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থাৎ সে.মি.$^{-1}$।

বর্ণালি ছাড়া তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের আর একটি প্রসঙ্গ বিক্ষেপণের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন, কারণ তা না হলে রামনের কাজের কথা আনা যাবে না। রামন-প্রভাব বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আলোর যে বিক্ষেপণ হয় তার সঙ্গে জড়িত। প্রভাবটি বর্ণালিবীক্ষণ সাহায্যে দেখা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

আলোর বিক্ষেপণ

প্রায় অন্ধকার কক্ষে বা কুঁড়েঘরে ফুটোফাটা দিয়ে আলো ঢুকলে ভেতরের ধূলিকণা বা ধোঁয়া ঝলসে ওঠে তা দেখেই বোধ হয় প্রত্যেকটি শিশু নিজে নিজে পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের প্রথম আবিষ্কারটি করে থাকে। আলোর গতিপথের সমকোণে বা আড়াআড়ি দেখলেই সব থেকে তা ভালোভাবে দেখা যায়। আমাদের প্রত্যেকেরই স্মৃতি হাতড়ালে মনে পড়বে, আমরা এই দৃশ্য দেখেছি এবং ধুলো ও ধোঁয়া আলোক রশ্মির মধ্যে উড়িয়েছি। হয়ত এমনও হতে পারে যে অন্ধকার ঘরে প্রথম সিগারেটের স্বাদ পাবার সময় অদৃশ্য সাক্ষী ছিল সূর্যরশ্মি।

আলোর রশ্মি কোন কণা, অণু বা পরমাণুর ওপর এসে পড়লে হয় সেটি শোষিত হবে, না হয় গতিপথ থেকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিচ্যুত হবে। স্বচ্ছ মাধ্যমের আলো পড়লেও আলো প্রথমে শোষিত হয় এবং আবার নিঃসৃত হয়, মাধ্যমের অন্তর্বর্তী গঠন এমন যে আপতিত আলো ও নিঃসৃত আলোর গতিপথ একই দিকে। রশ্মির যে অংশ আপতিত রশ্মির গতিপথের দিকে না গিয়ে অন্য দিকে বিচ্যুত হয় তাদের বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় বিক্ষিপ্ত। ঘটনাটি বোঝাতে বিক্ষেপণ কথাটিই যথোপযুক্ত। বিক্ষেপণ এমন কিছু দুর্লভ বস্তু নয়। অভিজ্ঞ পদার্থবিদ বা অন্ধকার ঘরে তরুণদের দেখার বিষয়ও নয়। আলোর বিক্ষেপণ অতি সাধারণ ঘটনা। আমার লেখার কালি যদি ঘন নীল হয় তার কারণ মাত্র এই যে আপতিত আলোর যে অংশটি চোখে ঘন নীল অনুভূতি জাগায় সেটা বাদে অন্য সব রঙ কালি শুষে নিচ্ছে। লেখার ওপর পড়া আলোর বাকি অংশগুলো অন্যান্য দিকে বিক্ষিপ্ত হয়।

1869 সালে ব্রিটিশ পদার্থবিদ জন টিন্‌ডাল প্রথম হাওয়ায় ভাসমান ধূলিকণা থেকে বিক্ষেপণের কথা ব্যাখ্যা করেন। টিন্‌ডাল ছিলেন ফ্যারাডের বন্ধু। তাঁর ওপর একটি স্মারকগ্রন্থও লেখেন। এ ছাড়া টিন্‌ডালই প্রথম বুঝতে পারেন যে আকাশের নীল রঙ হয় হাওয়ার অণুদের (বিশেষ করে নাইট্রোজেন অণুদের) দ্বারা বিক্ষেপণের জন্য। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। লণ্ডনের রয়াল ইনস্টিটিউশনের সভায় 1869 সালে তিনি আলো বিক্ষেপণের একটি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা করে দেখান। একটা কাঁচের নলে তিনি জল ও অল্প পরিমাণ অ্যামাইল নাইট্রাইট বাষ্প ভর্তি করেন। যেসব রোগীর হার্টে আনজিনা পেকটোরিস হয় তাদের ব্যাথা কমাবার জন্য ঐ অ্যামাইল নাইট্রাইট ব্যবহার করা

হয়ে থাকে। তারপর টিন্‌ডাল আর্ক ল্যাম্প থেকে আলোর রশ্মি ঐ নলটির ওপর ফেলেন। নাইট্রাইট বাষ্প ঘনীভূত হবার সময় প্রথমে ছোট ছোট বিন্দুতে পরিণত হয় এবং ক্রমশ বিন্দুগুলির আকার বড় হতে থাকে। আড়াআড়ি দিক থেকে দেখলে নাইট্রাইট থেকে বিক্ষিপ্ত আলোর রং প্রথমে দেখায় হাল্কা নীল, তারপর বিন্দুগুলির আকার বাড়তে থাকলে সেটা হয় ঘন নীল এবং আকার আরও বড় হলে রঙের মধ্যে সাদা আভা দেখা যায়। টিন্‌ডালের ব্যাখ্যা—বিন্দুগুলি ছোট অবস্থায় ক্ষুদ্র তরঙ্গ (নীল) বিক্ষিপ্ত করে, আকার বড় হতে থাকলে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সাদা গঠনকারী সব রং গুলিই বিক্ষিপ্ত হয়। তাঁর ব্যাখ্যায় বস্তুকণার আকারের সঙ্গে বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা সম্পর্কের কথা বলা হয়েছিল। আসলে বিষয়টি আরও অনেক জটিল।

অল্প কিছুদিন পর লর্ড র‍্যালে বিক্ষেপণ বিষয়ে বিস্তারিত তত্ত্ব প্রকাশ করেন। প্রথম গবেষণা পত্রটি প্রকাশিত হয় 1871[1] সালে। বিক্ষেপণকারী বস্তুকণার আকার আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের থেকে ছোট হলে বিক্ষেপণ ঠিক আকারের ওপর নির্ভর করে না, করে বস্তুকণার সংখ্যার ওপর এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের ব্যস্তনুপাতে। সুতরাং দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অনুপাতে হ্রস্ব তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো বেশি পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হয়। অন্যভাবে বলা চলে সাদা আলো রচক ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিক্ষেপণ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় হয়। সাদা আলোর বর্ণালিতে নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রায় 4400Å (অ্যাংস্ট্রম এককের কথা আগেই বলা হয়েছে) এবং লাল রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রায় 6600Å অর্থাৎ দেড় গুণ দীর্ঘ। তাই নীল আলো লাল থেকে (1.5^4) অর্থাৎ পাঁচগুণ বেশি বিক্ষিপ্ত হয়। নীল ছাড়া সূর্যের আলোর অন্য রঙের আলো তেমন বিক্ষিপ্ত না হয়ে সোজা নিজপথে চলে যায়। লাল এবং হলদে আলো, যার বিক্ষেপণের মাত্রা অনেক কম, বিক্ষিপ্ত নীল আলোর একাংশের সঙ্গে মিলে আবার সাদাই দেখায়। বিক্ষিপ্ত আলোর বাকি নীল পর্যবেক্ষণের জন্য থাকে। টিন্‌ডাল-র‍্যালে প্রভাবে বিক্ষিপ্ত আলোর তীব্রতা কিন্তু অতি অল্প, মূল রশ্মির তীব্রতা এক হাজার ভাগের এক ভাগ।

সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় রং কেন লাল হয় সেটা একই যুক্তির সাহায্যে র‍্যালে ব্যাখ্যা করেন। পর্যবেক্ষক ও সূর্যের মধ্যে একটি সরল রেখা দিয়ে যোগ করলে নীল আলো তার সমকোণ বরাবর বিক্ষিপ্ত হয়, তাই দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকা দর্শকের চোখে অবশিষ্ট লাল রঙটাই ধরা পড়ে। তা ছাড়া দিগন্তের আশপাশ থেকে সূর্যের আলো আসার সময় আবহমণ্ডলে পথ দীর্ঘতর হয় তার ফলে ভোরে ও সন্ধ্যায় উচ্চ শক্তি নীল আলোর শোষণও আপেক্ষাকৃত বেশি হয়।

যাই হোক র‍্যালে মনে করতেন যে আকাশের নীল রং প্রতিফলিত হয় বলেই সমুদ্রের রং

[1]লর্ড র‍্যালে : *ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন* 41, 107/274/447 (1871); 12, 81 (1881); 44, 28 (1897); 47, 375 (1899); *প্রসিডিংস অফ রয়্যাল সোসাইটি,* A84, 15 (1911); A90, 219 (1914)।

নীল। রামন পরে দেখান, তার এই ধারণা ঠিক ছিল না। আকাশ ও সমুদ্রের নীল রং বলতে গেলে আর একটি মন মুগ্ধকারী রঙের কথা মনে করিয়ে দেয়—মানুষের চোখের হাল্কা নীল কনীনিকার কথা। অবশ্য হেলমহোলৎজ[2] এই রোমাঞ্চের অবসান ঘটান বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়। কনীনিকা আসলে একটি ঘোলা মাধ্যম এবং অক্ষিগোলকের ভেতরের ঘোর অন্ধকার কালো পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে নীল আলো বিক্ষেপণ করে বলেই কনীনিকা নীল দেখায়। বাতাসের অণু যা বাতাসে ভাসমান ধূলা থেকে বিক্ষিপ্ত নীল থেকে কনীনিকার নীলের কোন ভেদ নেই। একই যুক্তিতে গায়ের রং কালো হয় কারণ, দেহ সাদা আলোর সবটাই শোষণ করে নেয় বলে ফর্সা লোকের বেলায় তা হয় না।

র‍্যালে বিক্ষেপণে বিক্ষিপ্ত বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মূল বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে ভিন্ন হয়; কেবল সাদা আলোর উপাদানগুলির মধ্যে কম্পাংক অনুযায়ী কয়েকটি অন্যদের থেকে বেশি বিক্ষিপ্ত হয়। আলোর গতিপথে বিভিন্ন কণার গায়ে আঘাত লেগে বিকিরণের এ অংশগুলি প্রত্যস্থ সংঘাতে মূল গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়। প্রত্যস্থ মানে সামগ্রিকভাবে মূল বিকিরণের শক্তির কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং একবর্ণী অর্থাৎ এক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কিরণপুঞ্জ ব্যবহার করলে র‍্যালের মত অনুযায়ী, যে মাধ্যম দিয়ে আলো যাচ্ছে তার থেকে আলোর সামান্য অংশ বিক্ষেপিত হবে, কিন্তু সেই অংশের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মূল একবর্ণী আলোর সমান হবে। 1914 সালে কাবান্নেস পরীক্ষা করে দেখান যে, ধূলিহীন বিশুদ্ধ গ্যাস থেকেও আলোর বিক্ষেপণ হয়। আলোর গবেষণার এরপর প্রায় দশ বছর আর কোন নতুন তথ্য জানা যায় নি।

অবশ্য এ স্মেকেল[3] 1923 সালে, এইচ. এ. ক্রামার ও ডব্লু. হাইসেনবার্গ[4] 1925 সালে এবং পি. এ. এম. ডিরাক[5] 1927 সালে তত্ত্বীয় বিচারে এই ইঙ্গিত দেন যে, বিক্ষিপ্ত আলোর মধ্যে আপতিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছাড়াও নতুন কিছু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকা উচিত যার মধ্যে বিক্ষেপণকারী মাধ্যমের বৈশিষ্টের সংকেত থাকবে। বস্তুত অনেক আগে 1878 সালে লোমেল[6] তার আলোর বিক্ষেপণ তত্ত্বে বলেছিলেন যে, বিক্ষিপ্ত আলোর মধ্যে বিক্ষেপকের অন্তস্থ দোলন অনুযায়ী পরিবর্তিত "কম্পাংকের মিশ্রণ" থাকবে। ডিরাক তার তত্ত্ব থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, "অতএব বিক্ষিপ্ত বিকিরণের উদ্ভব হচ্ছে দুটি প্রক্রিয়ার ফলে....এদের মধ্যে একটি শোষণ অন্যটি নিঃসরণ। এদের কোনটিতেই সমগ্র শক্তি এমন

---

[2] এইচ. হেলমহোলৎজ : *পপুলার লেকচারস,* অনুবাদ ই. এটকিনসন, লণ্ডন, 1873।

[3] এ. স্মেকেল : *ডাই নাটুরভিস,* 11,875 (1923)।

[4] এইচ. এ. ক্রামারস ও ডব্লু. হাইসেনবার্গ : *জাইটক্রিয়া ফিজিক* 31, 681 (1925)।

[5] পি. এ. এম. ডিরাক : *প্রসিডিংস অফ দি রয়্যাল সোসাইটি* 114, 710 (1927)।

[6] ই. লোমেল : *ভিডেম* : অ্যানালস 3, 251 (878)।

কি আংশিক ভাবেও সংরক্ষিত হচ্ছে না।" তাঁর তত্ত্বে দু-মুখী পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছিল অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ও হ্রাস।

মার্কারির 5461 Å অ্যাংস্ট্রমের একবর্ণী আলো দিয়ে বিক্ষিপ্ত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন মাপতে চেষ্টা করেছিলেন রস[7] 1923 সালে। 3,60,000 বিভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইন্টারফিয়ারো মিটার ব্যবহার করা সত্ত্বেও তিনি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কোন পরিবর্তন দেখতে সক্ষম হন নি।

[7] পি. এ. রস : *ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস প্রসিডিংস* 9, 246 (1923)।

চতুর্থ অধ্যায়

রামনের অবদান

তত্ত্বের ভিত্তিতে পাওয়া এক দূর সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করার দায়িত্ব নিলেন রামন। কলকাতায় বৌবাজার স্ট্রীটে ছোট্ট একটি ল্যাবরেটরিতে তখন কাজ করতেন তিনি। বর্ণালি বিজ্ঞানে তাঁর গভীর জ্ঞান ও দ্রুত চিন্তা শক্তি বলে তার দৃঢ় প্রত্যয় হল যে তিনি যা খুঁজছেন তা একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রভাব। দেখিয়ে দেবার জন্য তাঁর কোন গুরু ছিল না। ছিল একদল মরমী সহকর্মী যাঁরা তাঁর পর্যবেক্ষণে ও সংগ্রামে সহযোগী হয়েছিলেন একটি নতুন প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

সেটা 1928 সাল। চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি বা পত্রিকা বিমান ডাকে পাঠানো তখন দূর অস্ত। তবু রামন ও কৃষ্ণানের পেপারগুলি প্রকাশিত হবার কয়েকমাসের মধ্যেই দেখা যায়, জার্মানির প্রিংগ্‌সেম, ফ্রান্সের ক্যাবানেস ও আমেরিকার উড সবাই রামন প্রভাব নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছেন। যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে আমেরিকার দক্ষতা সর্বজনবিদিত। উড অতি অল্প সময়েই রামনের যন্ত্রের উন্নততর রূপ তৈরী করে অনেক পরিষ্কার বর্ণালি পান। বিভিন্ন তরল কোয়ার্টজ ও ক্যালসাইটে রামন প্রভাবের ওপর "রামন স্পেক্ট্রা অফ স্কাটার্‌ড রেডিয়েশন" (বিক্ষিপ্ত বিকিরণে রামন প্রভাব) শীর্ষক প্রবন্ধে উড তাঁর মন্তব্য রাখেন। প্রবন্ধটি অলিভার লজ ও জে. জে. টমসন পরিচালিত (আজকাল ব্যবহৃত 'সম্পাদিত' কথাটির বিনীত রূপ) ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে 1928 সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।[1] উড প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন, "খুব কম করে বললেও বলা যায় যে সনাতন তত্ত্ব অনুযায়ী এ ঘটনার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না এবং আমার মনে হয় আলোর কোয়ান্টামবাদ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে এর থেকে জোরালো তথ্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।" ঐ একই বছরে ক্যাবানেস[2] ও প্রিংগ্‌সেম[3] নতুন প্রভাবটির নাম-করণ করেন—রামন প্রভাব।

জার্মানিতে অবশ্য এটি "স্মেকাল-রামন এফেক্ট"[4] বলা হত। কয়েক মাসের মধ্যেই

---

[1] আর. এন. উড : *ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন,* 6, 730 (1928)।

[2] জে. ক্যাবান্নেস : *কুঁতে রেঁদো,* 186।

[3] প্রিংগ্‌সেম : *ডাই নাটুরভিস,* 16, 567 (1928)।

[4] উদাহরণ : কে. ডব্লু. এফ. কোলরাউস : *স্ট্রুকটার ডের মেটিরিএ ইন আইনৎসেলডার-স্টেলুনজেন* XII, জুলিয়স স্প্রিংগার 1931।

ল্যান্ডসবার্গ ও মানডেলস্টাম কোয়ারৎজে (স্ফটিক) এই প্রভাবের বিষয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।

আবিষ্কারের পথ কোনদিনই সহজ হয় না এবং ঐ একই পথে অনেক পথিক থাকেন। 1928 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রামন ও কৃষ্ণান প্রকাশ করেন শুধু বিক্ষিপ্ত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি অথবা কম্পাংক ও শক্তির হ্রাসের কথা। কিন্তু 1928 সালের মে মাসে তাঁরা হ্রস্বতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিষয়ও প্রকাশ করেন। 1928 সালের জুন মাসের প্রবন্ধে ক্যাবান্নেস বেনজিনে বিক্ষিপ্ত আলোর কেবলমাত্র দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিষয় প্রকাশ করেন এবং ভুল যুক্তি প্রয়োগ করে বলেন যে, সনাতনী তত্ত্ব অনুসারে হ্রাস ও বৃদ্ধি দুই হওয়ার কথা কিন্তু কোয়াণ্টাম তত্ত্বে কেবল বৃদ্ধির কথাই বলে। কিন্তু 1928 সালের জুলাই মাসে ল্যাণ্ডসবার্গ ও মান্‌ডলস্টাম[১] রামন ও কৃষ্ণানের অনুরূপ হ্রস্বতরঙ্গের কিছু বাড়তি ক্ষীণ 'সঙ্গী' রেখার কথা প্রকাশ করেন।

বাস্তবিকপক্ষে রামন প্রভাবের সদৃশ আরও তিনটি প্রভাব দেখা যায়। রামন প্রভাব ও অন্য প্রভাবগুলির মধ্যে পার্থক্য সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

টিন্‌ডাল-র‍্যালে বিক্ষেপণে বিক্ষিপ্ত আলো মূল কিরণপুঞ্জ থেকে নির্বাসিত একটি উপাংগ যার অনেকটাই হ্রস্ব-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নীল এবং অতি অল্পমাত্রায় দীর্ঘ-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের লাল। মূল কিরণ পুঞ্জ যদি এক রঙের বা এক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হয় তবে বিক্ষিপ্ত আলো সেই রঙের হবে।

প্রতিপ্রভায় বিক্ষিপ্ত আলো প্রতিপ্রভ বস্তুর বৈশিষ্ট্যসূচক এবং তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আপতিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের থেকে ছোট। যতক্ষণ আপতিত আলোয় শক্তি থাকে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করার ততক্ষণই প্রভাবটি দেখা যায়। সুতরাং বর্ণালী হয় প্রতিপ্রভ বস্তুর ধর্ম অনুযায়ী।

কম্পনে প্রভাব হয় তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের সঙ্গে মিথস্ক্রিয় বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রনের সঙ্গে সংঘাতের দরুণ বিক্ষেপণে। এর ফলে আপতিত বিকিরণ থেকে শক্তি ইলেকট্রনে চলে যায় এবং মিথস্ক্রিয়ার পর বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়ে। শক্তি ও ভরবেগের নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী বিক্ষেপণ কোণ নির্ভর করে। অন্য তিনটি প্রভাবের ব্যাখ্যায় ভরবেগের নিত্যতা সূত্র প্রত্যক্ষভাবে আসে না।

রামন প্রভাবে বিক্ষেপণকারী মাধ্যমের অণুদের সঙ্গে শক্তির আদান-প্রদান হয় এবং মিথস্ক্রিয়ায় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়তেও পারে বা কমতে পারে, ঠিক যেমন ডিরাক তত্ত্ব থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—অবশ্য হ্রস্বতরঙ্গ অর্থাৎ উচ্চতর কম্পাংকের অংশ অনেক কম। এটাই রামন প্রভাবের বৈশিষ্ট্য। সনাতন চিন্তাধারায় এর ব্যাখ্যা কিছুতেই করা যায় না। এর ব্যাখ্যায় কোয়াণ্টাম সংখ্যায়নের প্রয়োজন। তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে কি কি পরিবর্তন হবে তা নির্ভর

---

[১] জিলান্‌ডসবার্গ এবং এল. মানডেলস্টাম, *জাইস্টস্ক্রিফ্‌ট ফিজিক,* 50, 769 (1928); *ডাই নাটুরভিস,* 16, 557/772 (1928); *কঁতে রেঁদো,* 187, 109 (1928)।

করে অন্তর্বর্তী বিক্ষেপণকারী মাধ্যমের ওপর, আপতিত রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা তীব্রতার ওপর মোটেই নির্ভর করে না। আপতিত মুখ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (বা কম্পাংকের) ওপর পরিবর্তিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (বা কম্পাংক) পুনরারোপিত হয়, ফলে মুখ্য রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয়ে বর্ণালী স্থান পরিবর্তন করে, কিন্তু রামন রেখাগুলির স্থান অপরিবর্তিত থাকে। অতএব বলা যায় একটি বিশেষ বস্তুর ওপর আপতিত রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন অনুযায়ী স্থির রামন-রেখাগুলির স্থান পরিবর্তন হয় বটে তবে রামন-রেখাগুলির আপেক্ষিক স্থান অপরিবর্তিত থাকে।

ল্যাণ্ডসবার্গ ও মানডেলস্টাম রেখাগুলিকে বলেছিলেন স্যাটেলাইট বা সঙ্গী রেখা—বর্ণনটি খুবই স্পষ্ট ও চিত্রানুগ। রামন রেখাদের ব্যান্ডের পার্শ্বচর বলা যেতে পারে। কম্পটন প্রভাবে কেবল একটি রেখাই দেখা যায়। রামন বিক্ষেপণে কম্পটন প্রভাবের মত সরণ বিক্ষেপণের দিকের ওপর নির্ভর করে না এবং বিক্ষেপিত রামন আলোর দশার আপতিত আলোর দশার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না।

ব্রিটানিকাতে এ. এন. দা সি. আঁদ্রাদে[6] কয়েকবছর আগে লেখেন, রামন প্রভাবের ব্যাখ্যা মূল্যবান এবং 'তত্ত্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ'। রামন রেখাগুলির তীব্রতা র‍্যালে রেখাদের তুলনায় ক্ষীণ এবং নির্ভর করে বিক্ষেপকের ওপর। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

	অক্সিজেন (গ্যাস)	কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড (তরল)	ক্যালসাইট (কঠিন কেলাস)
র‍্যালে ও রামন তীব্রতার অনুপাত	3300	400	3.8

এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা হবে।

লণ্ডনের সুবিখ্যাত নেচার পত্রিকা প্রকাশনায় তৎপরতার জন্য সুবিদিত। ভাগ্য ভালো যে এই পত্রিকায় কে. এস. কৃষ্ণানের সঙ্গে যুগ্মভাবে লেখা এই আবিষ্কার 1928 সালের মার্চ মাসে ছাপেন। কারণ চার বছর আগে ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনের সম্পাদকরা সত্যেন্দ্র নাথ বোসের গবেষণা পত্র 'বিকিরণের ক্ষেত্রে প্ল্যাংকের সূত্রের যথাযথ ব্যুৎপত্তি' ছাপেনি। পরে 1925 সালে আইনস্টাইন সেই পত্র উদ্ধার করে জার্মানে অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।[7] ভারতে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিকাশ অজ্ঞাত থাকে আবার অনেকের প্রতিভার বিকাশের কোন সুযোগই থাকে না। অজানার সীমানায় পৌঁছেও সঠিক বিষয় নির্বাচনে সাহায্য না পাওয়ায় অনেক মেধার অপচয় হয়। এরাই সংখ্যায় বেশি। এদের মধ্যে সামান্য কিছু লোক সফলতার শীর্ষে উঠতে পারেন। সেটা সম্ভব হয় কেবলমাত্র

[6] রামন প্রভাব : *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* 1955, 18 খণ্ড, পৃ: 962।

[7] জি. এইচ. কেশোয়ানি, *সায়েন্স রিপোর্টার,* সি. এস. আই. আর, নিউ দিল্লী 1974, পৃ: 111।

তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা ও প্রতিভার বলে। তাই রামনের আবিষ্কার একটি বিরল কৃতিত্ব। আমাদের সামনে ভেসে ওঠে মাথায় পাগড়ি পরা সৌম্য, দীর্ঘকায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি মূর্তি—আমাদের দেশের মাটিতেই যাঁর উদ্ভব। ভারতীয় বিজ্ঞানের উপকূলে তিনি একটি লাইটহাউসের মত বিরাজমান যার দ্যুতি আর যে কোন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের থেকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এতে সব বলা হল না। ম্যাকগ্রহিল প্রকাশিত এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়ার্লড বায়োগ্রাফি[৪] বইটিতে বলা হয়েছে "রামন আধুনিক পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে সম্ভাবনাময় পুরুষদের অন্যতম"—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

[৪] 9 খণ্ড, পৃ: 91, 1973।

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিক প্রেক্ষাপট

সমাজ জীবনের একটি বিস্ময় হল এই যে দেখা যায় যারা বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সাহায্য করেছেন তারা সাধারণত মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এঁদের অবদান সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যই ছিল যে জ্ঞানের সাধক ও প্রচারক ব্রাহ্মণ অন্যের দান নিয়ে খেয়ে পরে থাকতেন। সম্পত্তি যা কিছু সবই ধারণ করতেন মাথায়। মানসিক শক্তি ও যথোপযুক্ত গর্ব থাকলে কিছু মাত্রায় দারিদ্র্য সুবিধাজনক হতে পারে।

মাদ্রাজ রাজ্যে তাঞ্জোর জেলার আইয়ামপেট গ্রামে অতি সামান্য অবস্থার একটি পরিবারে রামনের জন্ম হয়। এই পরিবারের লোকেরা বংশানুক্রমে চাষ বাস করতেন। তার মা পার্বতী আমল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বংশের মেয়ে। ভারতের এই প্রাচীন ভাষাটির ব্যাকরণ বোধ হয় সব থেকে সুসম্বদ্ধ। তার মাতামহ ভারতীয় দর্শনের ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বঙ্গদেশে যান। তখন বঙ্গদেশ ন্যায়শাস্ত্র পঠন পাঠনের জন্য সুবিদিত ছিল। আক্ষরিক অর্থে ন্যায় মানে কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ বা বিশ্লেষণাত্মক অনুসন্ধান। ন্যায় শাস্ত্রে তত্ত্বের যতার্থ্য নির্ণয়ে যুক্তি, তর্কের রীতি নীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিগত শতাব্দীর ভারতীয় সাধুসন্তদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পরিবারে হত এবং রামনের মানসিক উৎকর্ষ বিকাশে স্বভাবতই তার প্রভাব পড়েছিল। বাস্তবিক সেগুলি গভীর রেখাপাত করেছিল। 1930 সালের 11 ডিসেম্বর স্টকহল্‌মে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে নৈশভোজসভায় সুইডেনের রাজার স্বাস্থ্য কামনা করে সুরাপানের আহ্বানের উত্তরে রামন প্রাচীন ভারতের গৌরবের ও বুদ্ধের ত্যাগের উল্লেখ করেন এবং সুরার বদলে জল পান করেন।

রামনের বাবা চন্দ্রশেখর আয়ার ম্যাট্রিক পাশ ছিলেন। গত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সেটা খুব কৃতিত্বের কথা। তিনি বীণা ও বেহালা বাদনে পারদর্শী ছিলেন। এই বাদন যন্ত্রগুলি পরে তাঁর পুত্র পদার্থবিদ্যার সাহায্যে গবেষণার কাজে লাগিয়ে ছিলেন। তখনকার সামাজিক বিধান লঙ্ঘন করে তিনি ত্রিচিনাপলি ইংলিশ হাইস্কুলে ইংরাজী পড়াতে শুরু করেন। ত্রিচিনাপলির বর্তমান নাম তিরুচিরাপল্লী। এখানেই 1888 সালের 7 নভেম্বর রামনের জন্ম হয়। জগদীশ চন্দ্র বসুর বয়স তখন 30, তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্সের অধ্যাপক, তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গে গ্রাহক যন্ত্র নিয়ে গবেষণা করছেন। তখনও তিনি 'কোহেরার'

নামক গ্রাহক যন্ত্র দিয়ে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ ধরা পরীক্ষাটি দেখান নি। সেটা হয় লিভারপুলে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভায় 1896 সালে। এর প্রায় এক বছর আগে কাছাকাছি এরোড শহরে ভারতীয় গণিতবিদ রামানুজন 1887 খ্রীষ্টাব্দের 22 ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। রামানুজন 1920 সালে মারা যান। রামন যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন বেঁচে থাকলে রামানুজন কি করতে পারতেন অনুমান করতে ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে যে সব বিশিষ্ট পদার্থবিদ ভারতীয় বিজ্ঞানে সক্রিয় অংশ নেন তাদের জন্ম আগের শতাব্দীর শেষ ভাগে—মেঘনাদ সাহা ও মহলানবিশ 1893 সালে, এস. এন. বোস 1894 সালে এবং কে. এস. কৃষ্ণান 1898 সালে। এই সময়টিকে পদার্থবিদ্যায় ভারতের স্বর্ণযুগের উষা বলা যায়। সে সময় ভারতে প্রায় 160টি কলেজ ছিল কিন্তু মাত্র কয়েকটি কলেজেই স্নাতকোত্তর গবেষণা বা এক্সপেরিমেন্ট করার ব্যবস্থা ছিল এবং যা ছিল তাও নামমাত্র। বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছিল মাত্র একটি কলকাতায়, তার নাম ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অব সায়েন্স। 1876 সালে এক ধনী চিকিৎসক ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল বিজ্ঞানে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই প্রতিষ্ঠানে ইংরেজদের কোন হাত ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীন চিন্তাধারার প্রকাশের উদাহরণ বলা যায়। ভারতে কর্মক্ষেত্রের সব বিভাগেই নতুন আশা ও আলোর জন্ম হয় এই বঙ্গদেশে। কিন্তু এই অ্যাসোসিয়েশনে প্রাণ সঞ্চার হয় রামন যোগ দেবার পর।

একথা সত্য যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তাঁর তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের আদান প্রদান এবং উদ্ভিদের শারীরতত্ত্ব বিষয় গবেষণায়। এমন কি 1858 খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়ার অধীন ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠারও অনেক আগে 1841 সালে আরদেশির কারসেটজি ওয়াদিয়া নামে এক ভারতীয় লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। তবে একে বলা যেতে পারে আগুনের ফুলকি।

রামনের বাবা ম্যাট্রিক পাশ করার পরও পড়াশুনো করতে থাকেন এবং রামনের জন্মের পর 1857 সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে ভৌতবিজ্ঞানে ডিগ্রি লাভ করেন। ঐ একই সময়ে কলকাতায় ও বম্বেতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম এক সঙ্গে স্থাপিত হয়। পদার্থবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েই সম্ভব ছিল, অবশ্য ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অফ সায়েন্স ছাড়া সে কথা আগেই বলা হয়েছে। বিজ্ঞানে ডিগ্রি লাভ করায় রামনের বাবা ত্রিচিনাপল্লীর এস. পি. জি কলেজে লেকচারার পদে উন্নীত হন এবং তারপর বন্দরশহর বিশাখাপতনমে মিসেস এ. ভি. এন. কলেজে পদার্থবিদ্যা ও গণিত বিষয়ে লেকচারার হন। বিশাখাপতনমে তখনকার দিনেই জনসংখ্যা ছিল 40,000। পরিবারটি বাস করতেন কাছাকাছি ওয়ালটেয়ার শহরে। রামনের ছোটবেলা কেটেছিল ওপরে নীল আকাশ ও সমুদ্রের সান্নিধ্যে।

হয়ত মাঝে মাঝে খুঁজে বেড়াতেন "মসৃণতর নুড়ি বা সুন্দরতর ঝিনুকের খোঁজে।" খুব অল্প বয়সেই পদার্থবিদ্যায় রামনের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। গল্প শোনা যায় যে অসুস্থ হলে তার ছটফটানি থামানো যেতো কেবলমাত্র লিডেন জারের এক্সপেরিমেন্ট দেখিয়ে। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই সামান্য। কোন মতে গ্রাসাচ্ছাদন চলত। রামন অবস্থার বর্ণনা করে বলেছিলেন, "আমি জন্মেছিলাম তামার চামচ মুখে নিয়ে। জন্মের সময় আমার বাবার আয় ছিল দশ টাকা মাসে।"

1900 খ্রীষ্টাব্দে বারো বছর বয়সে রামন ম্যাট্রিক পাশ করে তার বাবার কলেজেই ভর্তি হন। দু বছর পর বিশাখাপতনম থেকে আই. এ. পাশ করে মাদ্রাজ চলে যান প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখান থেকে 1904 সালে বি. এ. এবং 1907 সালে এম. এ. পাশ করেন। সব পরীক্ষায় বরাবর প্রথম হয়েছেন এবং যত প্রাইজ ছিল সবই অর্জন করেছেন। তখন মাদ্রাজে এম এ পাঠক্রমে কেবলমাত্র 'ধ্বনি ও আলোক বিদ্যা'[1] বিষয়ে স্পেশাল পেপার পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। রামনের জীবনে বিশেষ আগ্রহের বীজ এখানেই রোপিত হয়েছিল।

রামন মাদ্রাজে তাঁর প্রবীন শিক্ষকদের খুব উচ্চ প্রশংসা করতেন—এরা অবশ্য সবাই ইংরেজ। 35 বছর পরে স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছিলেন, "মাদ্রাজের কলেজে যে চার বছর আমি কাটিয়েছি তার স্মৃতি অতি মধুর। তখন সব বিভাগীয় প্রধানই ছিলেন ইউরোপীয় তাঁদের কাছ থেকে অতিশয় স্নেহশীল ও সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছি। 35 বছর আগে তোলা কলেজের ফটোগ্রাফে যখন বালক বয়সের লুঙ্গী করে ধুতি পরা এবং বাড়ীতে বোনা আকারহীন টুপি মাথায় নিজের নগণ্য ক্ষুদ্র মূর্তির দিকে তাকাই তখন ঐ সব অধ্যাপকদের সহৃদয় আচরণ আরও বেশি বিস্ময়কর মনে হয়।" যখন মাদ্রাজে কলেজে ভর্তি হন তখন অধ্যাপক এ. এইচ. ইলিয়ট ওকে জিজ্ঞাসা করেন যে সত্যিই উনি বি. এ. ক্লাসের ছাত্র কিনা। সে সময় একবার চেষ্টা হয়েছিল অকাল পরিণত রামনকে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডে পাঠাবার। কিন্তু মাদ্রাজের সিভিল সার্জন রায় দেন যে ক্ষীণকায় বালকটি বিলেতের উগ্র আবহাওয়া সহ্য করতে পারবে না তাই চেষ্টাটি ব্যর্থ হয়। (রামানুজন বিলাতে গিয়ে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন ও পরে মারা যান)।

রামন ব্রিটিশ অধ্যাপকদের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হলেও, তিনি যা কিছু শিখেছিলেন সবই নিজের চেষ্টায়। 1957 সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী পুস্তকে তিনি লেখেন, "যে সব ছাত্ররা স্বনির্ভর তাদের নিজে নিজে কাজ করতে দেওয়ায় বিশ্বাস করতেন অধ্যাপক জোনস ...দু বছর এম এ পড়ার সময় আমার মনে আছে আমি একটি মাত্র বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম এবং তা অধ্যাপক জোনসের দেওয়া ফেব্রিপেরো ইন্টারফেরোমিটার বিষয়ে। অবশ্য 1939 সালে নেচার পত্রিকার সম্পাদকের কাছে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত মনে

[1] ডি. এম. বোস, *সায়েন্স এণ্ড কালচার*, 37, 220 (1971)।

হয়েছিল যে রামন কারও সাহায্য না নিয়েই পদার্থবিদ্যা আয়ত্ত্ব করেছিলেন। তাই রামনের পঞ্চাশতম জন্মদিবস উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স কতৃক প্রকাশিত গ্রন্থে গবেষণাপত্রগুলির সমালোচনা করতে গিয়ে নেচার পত্রিকার সম্পাদক[2] দুঃখ করে লিখেছিলেন যে প্রকাশিত গ্রন্থটিতে 'ভবিষ্যৎ নোবেলজয়ী পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আর. এল. জোনসের কাছে কতটা ঋণী সে কথা কোথাও বলা হয় নি। স্বর্গত অধ্যাপক আর. এল. জোনস ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবরেটরির ঐতিহ্য বহন করে ভারতে নিয়ে আসেন।'

---

[2] *নেচার,* 143, 326 (1939)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কালটিভেশান অফ সায়েন্স

কোন বিজ্ঞানীর কাছে IFD এই তিনটি অক্ষরের কোন অর্থই নেই, কারণ এটা এমনকি কোন রাসায়নিক সংকেতও নয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন ভারতীয়দের কাছে আই সি এস (ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস), আই পি (ইণ্ডিয়ান পুলিশ), আই এ এণ্ড এ এস বা আই এফ ডি (ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউন্টস সার্ভিস বা ইণ্ডিয়ান ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট) ইত্যাদিরা ছিল খুবই লোভনীয়। এতে ছিল উচ্চপদমর্যাদা সাধারণের তুলনায় অনেক বেশি কর্তৃত্ব। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে সব ভালো ছাত্ররাই এই লোভনীয় চাকরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসত। এতে সাফল্য লাভ করলে একটি নিশ্চিন্ত আরামদায়ক জীবন এবং সুন্দরী স্ত্রী পাবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এই করেই সীমিত বাছাই করা ব্যক্তি দিয়ে গড়ে উঠেছে ভারতীয় প্রশাসনের শক্ত কাঠামো।

প্রতিভাবান ছাত্র রামনের কাছে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চ্যালেঞ্জ মনে হয়েছিল। 1907 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ইণ্ডিয়ান ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের উচ্চতর পদের জন্য পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে 1907 সালের জুন মাসে মহামান্য ভারত সম্রাটের অধীনে সরকারী চাকরিতে বহাল হলেন। তখন তার বয়স 18 বছর 7 মাস, আইনত সাবালক বলা চলে না। এই চাকরির থেকে পদার্থবিদ্যা অনেক প্রিয় ছিল কিন্তু পিতা মাতা জানতেন যে টাকাই প্রতিষ্ঠা দেয় এবং সরকারের সিনিয়র ফিনান্স অফিসারের চাকরি নিতে বুঝিয়ে রাজি করালেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তিনি দশ বছর সম্রাটের চাকরি করেছিলেন—প্রথমে অ্যাসিস্টান্ট একাউন্টেণ্ট জেনারেল ও পরে ডেপুটি একাউন্টেণ্ট জেনারেল হিসেবে।

মাদ্রাজে যখন এম এ পড়ছিলেন তখনই ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে পদার্থবিদ্যায় রামনের প্রথম গবেষণা পত্র[1] প্রকাশিত হয়, বিষয়: 'আয়তাকার ছিদ্র জনিত অপ্রতিসম অপবর্তন ব্যাণ্ড'। ইংল্যাণ্ডের একটি বিখ্যাত ও অগ্রনী জার্নালে মাত্র সতেরো বছরের এক ভারতীয় ছাত্রের প্রবন্ধ প্রকাশ একটি বিরল ঘটনা। পদার্থবিজ্ঞানের নতুন বিষয়ে দীর্ঘতর প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রে ঐ জার্নাল ইংল্যাণ্ডে সব থেকে অগ্রগণ্য মনে করা হত, 'প্রসিডিংস অফ দি রয়্যাল সোসাইটি অফ লণ্ডন' এর থেকেও। রামনের আত্মবিশ্বাসের এটি একটি প্রকৃষ্ট

---

[1] সি. ভি রামন, *ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন,* 12, 494 (1906)।

উদাহরণ, যা জীবনে বহুবার তিনি দেখিয়েছেন। চাকরিতে ঢোকার আগে তিনি আরও দুটি গবেষণাপত্র[2] প্রকাশ করেন নেচার ও ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে। চাকরি করার সময় তিনি দ্বৈত জীবন যাপন করতেন, ঠিক যেমন আইনস্টাইন করতেন বার্ণে পেটেন্ট অফিসে কাজ করার সময়। চাকরিতে থাকার সময়ও বছরে গড়ে তিন বা চারটে করে গবেষণাপত্র প্রকাশ করে গেছেন—প্রায়ই আলোক বিদ্যা বা ধ্বনি বিদ্যার ওপর। একাউন্টেন্ট জেনারেল তার এই কার্যক্রম বহির্ভূত কাজের খবর জানতেন কিনা জানা নেই। তবে রামদাস[3] জানাচ্ছেন যে অফিসে তাঁর কাজের খুব কদর হ'ত। এই দশ বছর তিনি মোটামুটি কলকাতাতেই কাটিয়েছেন, যদিও মাঝে একবার রেঙ্গুন ও একবার নাগপুর যেতে হয়েছিল। দু বারই পুনরায় কলকাতায় বদলি নিতে সক্ষম হয়েছিলেন, একবারত কলকাতায় থাকার জন্য প্রমোশান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ কলকাতাকে তিনি বিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্র মনে করতেন।

ফিনান্স অফিসার হিসেবে রামন ছিলেন কড়া লোক। একবার এক কর্মচারিকে বরখাস্ত করলে অত্যন্ত প্রভাবশালী সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকা কর্মচারীর সপক্ষে দরবার করে এই 'বালক অফিসার'কে ধিক্কার দেয়। আমরা বিশ্বাস করি রামন ঠিকই করেছিলেন, কারণ একাউন্টেন্ট জেনারেল ঐ 'বালকে'র রায় মেনে নিয়েছিলেন।

1907 সালে কলকাতায় কাজে যোগদান করার পর বৌবাজার স্ট্রীট দিয়ে ট্রামে করে যেতে যেতে রামনের চোখে পড়ল একটি নামের ফলক "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অফ সায়েন্স।" সূর্যমুখী ফুল যেমন সূর্যের দিকে দেখে রামনও ঐ নামের ফলকের দিকে তেমন ভাবেই তাকিয়েছিলেন। দেখা গেছে অনেক সময়ই ছোট ছোট ঘটনার সূত্র ধরেই পরে মহৎ কাণ্ডের আবির্ভাব হয়। এই নামের ফলক দেখার সূত্র ধরে যে ঘটনা পরম্পরা শুরু হয় তারই ফল রামন প্রভাবের আবিষ্কার।

আগেই বলা হয়েছে যে এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। অন্যান্যদের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবেরও চিকিৎসা তিনি করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে তিনি অনেক গভীর আলোচনা করেছিলেন। মহেন্দ্রলাল কিছু টাকা চাঁদা তুলে বাংলার তদানন্তীন লেফটানান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পলের আনুকুল্যে 210 বৌবাজার স্ট্রীটে অসম্পূর্ণ বাড়ী সমেত জায়গাটি জোগাড় করেন এবং সেখানে বক্তৃতাকক্ষ ও গবেষণাগার স্থাপন করেন। কিন্তু তখন পুরোপুরি গবেষক নিয়োগ করার মত আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। সুতরাং তখন বিভিন্ন বক্তৃতার ব্যবস্থা করাই ছিল প্রধান কাজ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বোস, স্যার আশুতোষ মুখার্জী, ফাদার লাফোঁ, মহেন্দ্রলাল সরকার নিজে এবং অন্যান্যরা। 1904 সালে মহেন্দ্রলালের পরলোকগমনের পর তাঁর পুত্র অমৃতলাল

---

[2] সি. ভি রামন, *নেচার* 76, 736 (1907) এবং *ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন,* 14, 591 (1907)।

[3] এল. এ. রামদাস : *জার্নাল অফ ফিজিক্স এডুকেশন,* 1, 2 (1971)।

অ্যাসোসিয়েশনের অবৈতনিক সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

ট্রাম থেকে নেমে রামন যখন অ্যাসোসিয়েশনের বাড়ী প্রবেশ করেন তখন অমৃতলাল সেখানে হাজির ছিলেন। তার সঙ্গে দেখা করে রামন ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে অবসর সময়ে অ্যাসোসিয়েশনে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন কিনা। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের কথা রামদাস[4] লিখেছেন, "আগ্রহের আতিশায্যে ডাঃ অমৃতলাল সরকার রামনকে জড়িয়ে ধরে বললেন যে বহু বছর ধরে তার আগমনের জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন এবং এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা তার বাবা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার আজ বেঁচে থাকলে কত আনন্দিত হতেন।"

মনে হয় রামনও সমান শিহরণ অনুভব করেছিলেন ভবিষ্যতের হাজার হাজার নতুন সম্ভাবনা ও আবিষ্কারের স্বপ্নে। 1907 সালের সেই দিন থেকে 1933 সালে কলকাতা ছাড়া পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষামুলক গবেষণা রামন এই অ্যাসোসিয়েশনের পরীক্ষাগারেই করেছেন।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখার্জী নিজেও একজন কৃতি গণিতজ্ঞ ছিলেন এবং কলকাতায় স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান পঠন পাঠন ও গবেষণার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছিলেন। রামনের গবেষণার কাজ তার নজরে পড়ে। এরপর স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। 1914 সালে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে বক্তৃতায় বলেন, "আমাদের সৌভাগ্য যে পদার্থবিদ্যায় স্যার তারকনাথ পালিত অধ্যাপক পদ গ্রহণ করতে মি. চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন রাজী হয়েছেন। ভৌত বিজ্ঞানের গবেষণায় ইনি এর মধ্যেই বিখ্যাত এবং এর খ্যাতি ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত। অত্যন্ত বিরূপ অবস্থার মধ্যে এবং সরকারী কাজে ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও ইনি অক্লান্ত পরিশ্রমে গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করেন এবং সারা জীবন ব্যয় করেন দেশে বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধনের জন্য। সেইখানে মূল্যবান গবেষণা হচ্ছে একথা ভাবতেও ভালো লাগে। বলতে লজ্জা হয় যে অধ্যাপক পদের বেতন সামান্য, তবু উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ লোভনীয় সরকারী উচ্চপদ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ নিতে রাজী হয়ে মি. রামন যে সাহস ও মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাঁর প্রতি আমার যে আন্তরিক শ্রদ্ধা তা যদি না জানাই তবে আমার কর্তব্যে ত্রুটি থেকে যাবে। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে আমরা সবাই যে জ্ঞানের মন্দির প্রতিষ্ঠার উচ্চাশা করছি তার জন্য সত্যের পূজারীর অভাব কোন দিন হবে না।" যাই হোক পালিত অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করতে আইনগত বিধিনিষেধ পার হতে কিছুদিন লাগল এবং রামনেরও সরকারীপদ থেকে ইস্তফা দিয়ে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করতে কিছু দিন কাটল। অবশেষে 1917 সালে উনি

---

[4] এল. এ. রামদাস, *ঐ*, পৃ: 2

ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্সে যোগ দেন। রসায়নে পালিত অধ্যাপক ছিলেন অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। ইনি এর আগে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ডঃ রাসবিহারী ঘোষের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে 1914 সালে আরও চারটি অধ্যাপক পদ স্থাপিত হয়। এই পদে যোগ দেন গণেশ প্রসাদ (ফলিতগণিত), ডি. এম. বোস (পদার্থবিদ্যা), পি. সি. মিত্র (রসায়ন) এবং এস. পি. আগারকার (উদ্ভিদবিদ্যা)। দেখা যাবে যে তখনকার কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্বাচনে প্রাদেশিকতার কোন স্থান ছিল না। এই সব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ছিলেন এস. এম. বোস (বোস-আইনস্টাইন খ্যাত) এম. এন. সাহা (তাপ আয়নন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা এডিংটন এই তত্ত্বকে বিরাট সাফল্য বলে বর্ণনা করেছেন) এবং এস. কে. মিত্র। এই তিন জনই উত্তরকালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সবই স্যার আশুতোষের দূরদৃষ্টির নির্দর্শন স্বরূপ, তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল মেধা খুঁজে বার করার। মাদ্রাজ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী একবার মন্তব্য করেছিলেন যে স্যার আশুতোষ না থাকলে রামন একজন দক্ষ একাউন্টেণ্ট জেনারেল হিসেবে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করতেন।

সাধারণত রামন সকালে কাজ করতেন অ্যাসোসিয়েশনে এবং অপরাহ্নে সায়েন্স কলেজে। অ্যাসোসিয়েশনে প্রথম বিজ্ঞান সম্মেলন হয় 1917 সালে। স্যার আশুতোষ এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়ে বলেন,

> এই সম্মেলন উদ্বোধন করতে এসে অধ্যাপক রামন ও শ্রোতাদের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করতে চাই না। কারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মত আমিও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি বাংলাদেশে ভৌত বিজ্ঞানে প্রগতির কথা শুনতে এবং আমি নিশ্চিত যে বক্তৃতা চিত্তাকর্ষক হবে। ....আজ আমরা যে ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছি তা দেখতে পেলে আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃত ও এই গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কি খুশিই না হতেন। বিজ্ঞানে যাদের আগ্রহ, ছোট বড় নির্বিশেষে, তিনি তাদের সকলেরই আধ্যাত্মিক পিতা (হাততালি)।

বাংলাদেশে ভৌতবিজ্ঞান চর্চার প্রগতি সম্বন্ধে রামন বললেন,

> কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত অধ্যাপকপদে যোগ দেবার আগে 1907 সালের জুলাই মাস থেকে 1917 সালের জুন মাস পর্যন্ত দশ বছর একজন নিরপেক্ষ দর্শকের খোলা মন নিয়ে পদার্থবিদ্যার পঠন, পাঠন ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ভাবে চলেছে সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি। এই পর্যালোচনা করলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এই সময়ে সত্যিকারের প্রগতি হয়েছে। এ কথাও বলা যায় যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার গবেষণার একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, যার সমতুল্য ভারতের আর কোথাও নেই এবং ঐ ঐতিহ্য ইউরোপ বা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় খুব পেছিয়ে নেই। যে হারে প্রগতি হয়েছে সেটাই আমাকে সব থেকে বেশী আকৃষ্ট করেছে। দশবছর আগে আমরা যেখানে ছিলাম, তার থেকে আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি। ভবিষ্যতের দিকে তাকালে এটাই সব থেকে আশার কথা।.....
>
> আমার নিজের কাজ শুরু হয়েছে 1907 সালে। বর্তমান সেক্রেটারী ডঃ এ. এল. সরকার আমাকে যে সব বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছেন তার জন্য এই কাজ করা সম্ভব হয়েছে। ইণ্ডিয়ান

> ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের অফিসারের দায়িত্ব পালন করার ফাঁকে ফাঁকে যাতে আমি গবেষণা চালাতে পারি তার জন্য অনেক রাত পর্যন্ত ল্যাবরেটরি খোলা রেখে তিনি এই সুযোগ দিয়েছেন। ক্রমে ক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের এই উদ্যোগে আরও অনেকে এসে যোগ দিয়েছেন। এই সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যাবে বার্ষিক রিপোর্ট ছাড়াও প্রকাশিত চোদ্দটি বিশেষ বুলেটিনে এবং তিনখণ্ড প্রসিডিংসে। এই প্রকাশনাগুলি বিদেশে সাদরে গৃহীত হয়েছে এবং এখন অ্যাসোসিয়েশন পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সোসাইটির সঙ্গে গবেষণাপত্র আদান প্রদান করে থাকে।

1919 সালে অমৃতলাল সরকারের মৃত্যুর পর রামন অ্যাসোসিয়েশনের অবৈতনিক সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। একই সঙ্গে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারগুলিরও চার্জে ছিলেন। 1933 সালে কলকাতা ছেড়ে বাঙ্গালোর যাওয়া পর্যন্ত রামন অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন। তখন তাঁর বয়স 45। সেই সময় অ্যাসোসিয়েশনের আকার ছোট হলেও খুবই সজীব ও কর্মব্যস্ত ছিল। অ্যাসোসিয়েশনের প্রসিডিংসে নানান গবেষণা পত্রের মধ্যে রামনের দেওয়া আর্থিক হিসাবপত্রও ছড়িয়ে আছে। 31 ডিসেম্বর 1922 জমার খাতায় ছিল ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কে 3349 টাকা 5 আনা 6 পাই আর ক্যাশ 241 টাকা 4 আনা 6 পাই। আর কোম্পানীর কাগজে 2,30,000 টাকা (3½) সুদে। অনেক সময় দেখা গেছে যে কেবল টাকা থাকলেই কাজ হয় না।

সপ্তম অধ্যায়

সমুদ্রের রং

সমুদ্রের রং নিয়ে নানান কবি নানান মত ব্যক্ত করেছেন। হোরেস মনে করতেন রঙটি সুরার মত গভীর আবার এণ্ড্রু মার্বেল বলতেন নীল। এক নাম না জানা ব্রিটিশ কবির কথায়

যতক্ষণ না তিনি গভীর নীল সমুদ্রের তলদেশে
এক মৎস্যকন্যার কাছে এলেন কণ্ঠে গান
হে ব্রিটানিয়া, তুমি শাসন কর। সমুদ্রতরঙ্গ তোমার আদেশে চালিত হয়।'

রামন তাঁর নোবেল বক্তৃতা শুরু করেন সমুদ্রের রঙের কথা বলে স্মৃতিচারণ করে বলেন 1921 সালে প্রথম ইউরোপ সফরের সময় ভূমধ্যসাগরের গাঢ় নীল রং তাকে এত অভিভূত করেছিল যে তার থেকেই তিনি রং নিয়ে গবেষণার অনুপ্রেরণা পান এবং তার ফল হিসেবে পান নতুন (রামন) প্রভাব। ভূমধ্যসাগরে যাওয়ার সময় কোন মৎস্যকন্যার দেখা পেয়েছিলেন কিনা সে কথা রামন কোথাও লেখেন নি। যে কারণে আকাশের রং নীল সেই একই কারণে সমুদ্রের রঙও নীল। এটা হয় জলের অনুগুচ্ছের থেকে আলোর প্রত্যস্থ বিক্ষেপণের ফলে, এ কথা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লাল, হলদে, সবুজ ও আলোর অন্য উপাদানগুলি সমুদ্রের জলের অণুগুলিতে শোষিত হয়ে তাপে পরিণত হয়, কেবল নীল অংশটির বেশির ভাগ বিচ্ছুরিত হয়। কিন্তু মহামতি লর্ড র‍্যালের বিশ্বাস ছিল যে আকাশের নীল রঙের প্রতিফলনের জন্যই সমুদ্রের রং নীল। রামন[1] একটি গবেষণাপত্রে দেখান সমুদ্র যে পরিমাণে নীল তার সামান্য একটা অংশ আকাশের রঙের প্রতিফলনের জন্য এবং তাও সময় বিশেষে।

রামন বিষয়টি তত্ত্বের দিক থেকে বিবেচনা করেন এবং আইনস্টাইন ও স্মোলুকোস্কির ফর্মুলা প্রয়োগ করেন।

এক ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের তরল থেকে আপতিত আলোর দিকের সমকোণ বরাবর ব্যাপ্ত আলোর তীব্রতা

$$= \pi^2/18 \,.\, \beta/\lambda^4 \,.\, RT/N\ (\mu^2 - 1)^2\ (\mu^2 + 2)^2$$

যেখানে λ = তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

---

[1] সি. ভি. রামন : স্কাটারিং অফ লাইট ইন ওয়াটার এণ্ড দি কালার অফ দি সী, *প্রসিডিংস রয়্যাল সোসাইটি* (A) 101, 64 (1922) কমিউনিকেটেড বাই ডঃ ওয়াকার, এফ. আর. এস. ডিরেক্টার জেনারেল, মেটেরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া।

β = তরলের সংনম্যতা
(গ্যাসের ক্ষেত্রে 1/চাপ)
μ = প্রতিসরাংক

এবং R, T, N গতি তত্ত্বে ব্যবহৃত সংকেত (মনে রাখতে হবে R এবং N প্রতি গ্রাম অণুর জন্য প্রতি একক আয়তনের জন্য নয়) অণুদের কম্পন ও হ্রাসবৃদ্ধি জনিত ঘনাংকের পরিবর্তন থেকে তরলের প্রতিসরাংকের হ্রাস বৃদ্ধি হয় তার ফলে আলোর বিক্ষেপণ হয় এই ধারনার ভিত্তিতেই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত। রামন প্রমাণ করেন যে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে 30^0 সে তাপ মাত্রায় জল সমপরিমাণ ধূলি-মুক্ত বায়ুর থেকে 159 গুণ বেশি মাত্রায় আলো বিক্ষেপণ করে। তিনি দেখান যে জলে শোষণের হিসাব না ধরলে 50 মিটার গভীর জল আকাশের সর্বোচ্চ) স্থানের নীল রঙের সমান নীল দেখাবে। শোষণের জন্য শোধন করে তিনি দেখান যে তত্ত্ব ও পরীক্ষালব্ধ ফল বেশ মিলে যাচ্ছে। এই কাজে এল. এ. রামদাস তার সহকর্মী ছিলেন।

দেখা যায় যে এই কাজটির ওপর রামনের বিশেষ অনুরাগ ছিল। কারণ এই কাজের সূত্র ধরে যে সব গবেষণার উন্মেষ হয় তারই পরিণতি হিসেবে আসে তাঁর আবিষ্কার। তাঁর খুশি হওয়ার আর একটা কারণ নিঃসন্দেহে এইজন্য যে তিনি র‍্যালের মত নামী পদার্থবিদের অনুমান শুধরে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু কাজটি খুব যে উচ্চমানের সে কথা বলা যায় না। তা ছাড়া সোলেজকিন[2] দাবী করেন যে কাজটা তিনি আগেই করেছেন। রামন ও রামনাথন কাজটি আরও এগিয়ে নিয়ে যান। পরে জার্মান পদার্থবিদ গানস[3] বলেন যে রামন ও রামনাথন তাদের বিচারে কেবলমাত্র সমুদ্রের জলে লম্বভাবে আপতিত আলোর কথাই ধরেছেন। গানস তার হিসেবে তির্যক আপতন ও ধ্রুবণেরও পরিমাণ ও যোগ করেন।

এই ভাবেই বিজ্ঞান এগিয়ে চলে। যতই শুদ্ধ ও মার্জিত করা হোক কিছু না কিছু খুঁত থেকে যায়।

[2] ডব্লু. সোলেজকিন : *অ্যানলে ডার ফিজিক*, 75.8, 825 (1924)।
[3] আর. গানস : *অ্যানাল ডার ফিজিক*, 75.1, 1 (1924)।

অষ্টম অধ্যায়

আচার্য

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ইংরাজীর অধ্যাপক বলতেন যে কোন দেশ বর্তমান সভ্যতায় কতটা আধুনিক তা মাপা যায় মাথা পিছু কতটা সাবান ধোয়া জল নর্দমায় যায় তা দিয়ে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে আমি ধার্মিকতার উপরে বসাতে রাজি, কিন্তু আমার মনে হয় সভ্যতার মাপ কাঠি হওয়া উচিত দেশে আচার্যদের সংখ্যা, মান ও প্রতিপত্তির ওপর। তারাই মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে সমাজ ও ইতিহাসের মোড় ঘোরান রাজনীতিবিদরা, কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরাও আমাদের শিক্ষাক্রমের ফল। তারা তো একদিন শিক্ষকদের হাতেই তৈরী হয়েছেন। এক বিশিষ্ট আচার্যের চাই পাণ্ডিত্য, ন্যায়পরায়ণতা এবং ছাত্রের মঙ্গলের জন্য নিরন্তর উদ্বেগ। রামনের এই তিনটি গুণই ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে। তিনি মোট 34 জন সহকারী ও সহকর্মীর সঙ্গে যুগ্মভাবে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। (অধ্যায়ের শেষে নামের তালিকা আছে)। তিনি প্রায় 150 জন তরুণকে স্বাধীন গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।[1] নোবেল বক্তৃতায় দশজন সহকর্মী ও ছাত্রদের উল্লেখ করেন। (রামনাথন, কামেশ্বর রাও, শ্রীবাস্তব, রামদাস, কৃষ্ণান, রামকৃষ্ণ রাও, রামচন্দ্র রাও, ভগবন্তম, কৃষ্ণমূর্তি এবং রামস্বামী) এই বক্তৃতাটি পড়লে মনে কোন সন্দেহ থাকে না যে তার নিজের অবদান ঠিক কতটুকু ছিল। বিভিন্ন ছাত্রদের কাজের যোগসূত্র ছিলেন রামন নিজে এবং তিনি তাদের কাজ নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে গেছেন। (কৃষ্ণানের অবদানের কথা পরে আলোচনা করা হবে)। রামনের মৃত্যুর পর তার ছাত্র ও সহকর্মীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি[2] থেকেই বুঝতে পারা যায় যে কত ভালবাসা তিনি তাদের কাছে পেয়েছেন। একজন ত তাঁকে শিবের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যার কাছে নিজের ছেলের থেকে ছাত্রের দাবি বেশি।

কিএর্কাগার্দ বলতেন সকল প্রতিশ্রুতির স্রষ্টা হলেন ঈশ্বর। ছাত্রদের কাছে শিক্ষকই ঈশ্বরের ভূমিকা নেন। রামন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছেন, অনেক প্রতিশ্রুতির সৃষ্টি করেছেন এবং সফল পরিণতিও দেখেছেন। ভারতের আর কোন পদার্থবিদ এত বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে গবেষণা পরিচালনা করেন নি। আমাদের দেশে এঁর খুব কাছাকাছি

---

[1] আর. এস. কৃষ্ণান : *জার্নাল অফ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ*, 30.2 (1971) সি. এস. আই. আর. নিউদিল্লি।

[2] *কারেন্ট সায়েন্স*, মে 5, 1971।

দ্বিতীয় স্থানটি সাহার বলা যায়। রামনকে তুলনা করা চলে ইংল্যাণ্ডের রাদারফোর্ড বা জার্মানীর সমারফিল্ডের সঙ্গে—যাদের সাহচর্যে মেধাবী গবেষক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এ কথা সত্য তার নিজের (কৃষ্ণানের সঙ্গে যুগ্মভাবে) আবিষ্কার ছাড়া রামনের ছাত্রদের দীর্ঘ-কাল ব্যাপি পরিশ্রমসাধ্য গবেষণায় অন্য কোন আবিষ্কার হয় নি। টাটন বলেন প্রতিটি আবিষ্কারের জন্য লাগে প্রচুর পরিমাণে কপালের জোর এবং কিছু যুক্তি। তবে এ কথাও ঠিক যে সুযোগ সুবিধা ও যন্ত্রপাতির অভাবে ভারতীয় গবেষকরা সব সময় ফলপ্রসূ কার্যক্রমে হাত দিতে পারেন নি। ক্রমে ক্রমে যন্ত্রপাতি দূর্মূল্য হয়ে পড়ায় অসুবিধা আরও বেড়ে যায়। রাদারফোর্ড ও রামনের আমলের মত কলেজের ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি বা ভাঙাচোরা জিনিসের গাদা থেকে সংগ্রহ করা মাল মশলা দিয়ে গবেষণার দিন আর রইল না। আজকাল উন্নতিকামী দেশের বিজ্ঞানীদের এখন সাফল্যের আশায় উন্নত দেশগুলিতে গিয়ে কাজ করতে হয়। এইভাবে উন্নতিকামী ও উন্নত দেশগুলির মধ্যে ফারাক ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। এই ফারাক কেবল সঙ্গতি ও উৎপাদনের টেকনিকের মধ্যে নয়, এই টেকনিক আয়ত্ব করার উপযুক্ত সঙ্গতিরও। উন্নতিকামী দেশগুলির সামনে কোন আশা দেখা যাচ্ছে না। তবে ইতিহাসের চাকা কখনও থেমে থাকে না, একদিন ঘুরবেই।

অধ্যাপক সি. ভি. রামনের সহকর্মী ও যুগ্মলেখকরা

সর্বশ্রী এস. আপস্বামিআর
এ. দে
পি. এন. ঘোষ
বি. ব্যানার্জি
জি. এ. সাদর্লাণ্ড
জি. এল. দত্ত
কে. শেসাগিরি রাও
এন. কে. সেথি
ভি. এস. টাম্মা
কে. আর. রামনাথন
এ. এস. গণেশন
কে. ব্যানার্জি
এ. এস. কৃষ্ণান
এল. এ. রামদাস
এস. কে. দত্ত
আই. রামকৃষ্ণ রাও
সি. এম. সোগানি

সর্বশ্রী এস. সি. সরকার
পি. কৃষ্ণমূর্তি
এস. ভগবন্তম
এস. ডব্লু. চিঞ্চলকার
বি. ভি. রাঘবেন্দ্র রাও
এন. এস. নগেন্দ্রনাথ
কে. সুব্বারামাইয়া
ভি. এস. রাজগোপালন
পি. নীলকান্তন
জি. আর. রেণ্ডাল
এস. রামশেষণ
এ. জে. জয়রামন
টি. কে. শ্রীনিবাসন
ডি. কৃষ্ণমূর্তি
এম. আর. ভাট
কে. এস. বিশ্বনাথন
এস. পঞ্চরতনম

নবম অধ্যায়

ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস, 1929

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় 1913 সালে। স্যার আশুতোষ মুখার্জি উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং পদার্থবিদ্যা শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন রামন। 1929 সালের 2 জানুয়ারী, রামনের আবিষ্কারের পরের বছর, ষষ্ঠদশ অধিবেশন হয় মাদ্রাজে এবং রামন ছিলেন মূল সভাপতি। ঐ একই বছরে পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি হন এস. এন. বোস। তখনও নোবেল পুরস্কার পান নি এবং রামন তাঁর আবিষ্কারের পুরো আস্বাদও পান নি। তাই স্বভাবতঃই তিনি তখন তার নতুন প্রভাবের নানা তথ্যে পরিপূর্ণ, তাঁর নানান পর্যবেক্ষণের ফল সভাপতির ভাষণে উজাড় করে দেন। তিন দিকপাল বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন ও বোরের উল্লেখ করে তিনি প্রথমে চেষ্টা করেন ফোটন বা আলোক কণার তরঙ্গ ও কণা এই দ্বৈত অবস্থার ব্যাখ্যা করতে। ফোটন বর্ণনা করতে আমরা প্রথমেই বলি তার কম্পাংক ν, তাই ফোটন hν শক্তির একটি প্যাকেট বা গুচ্ছ, আরও ভালো করে বলতে গেলে বলতে হয় মালা। বিকিরণের কণার (বা ফোটনের) ν-এর ভৌত অর্থ কি? ν যদি এর বৈশিষ্ট্যমূলক কম্পাংক হয় তবে এর প্রকৃতি নিশ্চয় তরঙ্গ-ধর্মী। রামনের মতে কম্পটন প্রভাবও বিকিরণের তরঙ্গ ধর্ম প্রমাণ করে। তিনি এই মত ব্যক্ত করেন যে ফোটনকে 'আকৃতি, আয়তন ও স্থান' হীন নিরাকার ভাবা যায় না। তবে এ বিষয়ে তিনি নির্দিষ্ট কিছু বলেন নি।

এরপর তিনি নিজের আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা করেন। সহকর্মী কে. আর. রামনাথন ও কে. এস. কৃষ্ণানের "উল্লেখযোগ্য মৌলিকতা" ও তাদের "নিজস্ব অবদানের" ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে (গুণগত ভাবে বলতে গেলে) আবিষ্কারটি প্রথম ধরা পড়ে 1923 সালে। ঐ সালে রামনাথন বেগুনি রং পাওয়ার জন্য সূর্যের আলোর সামনে বেগুনি ফিলটার ব্যবহার করেন কিন্তু বিক্ষিপ্ত আলোয় বেগুনি ছাড়াও দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্ষীণ সবুজ রেখা পাওয়া যায়। বিক্ষিপ্ত আলোর সামনে বেগুনি ফিল্টার বসিয়ে বেগুনি রং শুষে নিয়ে সবুজ আলোর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয়ে থাকে যে নতুন কোন ঘটনা ঘটতে দেখলে তখনই তার কোন সমাধান বা সদুত্তর পাওয়া যায় না! এ কথা আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে র‍্যালের বিক্ষেপণের থিওরি অনুযায়ী আপতিত আলোর

যে রং বিক্ষিপ্ত আলোর রঙও তাই থাকবে বিক্ষেপক মাধ্যম কেবল কিছুসংখ্যক আপতিত ফোটনের গতিপথের দিক পরিবর্তিত করে। 1923 সালের পর্যবেক্ষণে দেখা গেল যে বিক্ষেপক মাধ্যমে আপতিত আলোক রশ্মির একটা অংশের কম্পাংক ও শক্তি পরিবর্তিত হচ্ছে। অবশ্য সেই সময় মোটামুটিভাবে রঙের পরিবর্তনের কথা জানা গিয়েছিল, বিক্ষিপ্ত আলোর সঠিক কম্পাংক মাপা হয় নি। তাছাড়া এই পর্যবেক্ষণের কোন ব্যাখ্যাও জানা ছিল না। বিক্ষেপক পদার্থগুলির অনেক শোধন করা সত্ত্বেও ঐ রেখা আসতেই থাকল। এর পরই বর্ণালী বিশ্লেষণ করা হল তা সত্ত্বেও কোন সদুত্তর খুঁজে পাওয়া গেল না। এই পর্যবেক্ষণের মর্মার্থ উদঘাটিত হয় 1927 সালে যখন রামন ভাবলেন "এটি কম্পটন প্রভাবের যমজ ভাই"। কিন্তু কম্পটন প্রভাব ও রামন প্রভাবের সম্পর্ক ঠিক তা নয়। কম্পটন প্রভাবের ক্ষেত্রে এক্সরের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র এবং কম্পাংক উচ্চ সুতরাং উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফোটন হাল্কা মৌলদের পরমাণুর বাইরের দিকে আলগা করে বাঁধা ইলেকট্রনদের সঙ্গে শক্তি বিনিময় করে। রামন প্রভাবে দৃশ্য আলোর নিম্ন শক্তির ফোটন আস্ত অণুদের সঙ্গে বিক্রিয়ায় শক্তি হারায় বা কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তি বৃদ্ধি করে। রামন প্রভাব দ্বিমুখী। মুলগত বিচার করলে বলতে হবে যে 'বিপরীত' কম্পটন প্রভাবও থাকা উচিত—যেখানে অতি উচ্চশক্তি সম্পন্ন এবং সেইজন্য মুক্ত ইলেকট্রন এক্সরে ফোটনের সঙ্গে সংঘাতে কিছু শক্তি দিয়ে উচ্চশক্তিস্তর থেকে নিম্নশক্তি স্তরে নেমে আসবে। তবে এ ধরনের পরিবেশ আছে তারা দেহে। তারা দেহের অভ্যন্তরে, যেখানে অতি উচ্চশক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রন থাকে, 'বিপরীত কম্পটন প্রভাব' হতে পারে এ কথা প্রথম বলেন রামনের ভ্রাতুষ্পুত্র এস. চন্দ্রশেখর। দুটি প্রভাবের মধ্যে সাদৃশ্য আছে ঠিকই কিন্তু যমজ বলা যায় না। এটা বুঝতে রামনেরও দেরি হয় নি যে "কম্পটন প্রভাবের থেকে এই নতুন বিকিরণপ্রভাব ধর্মগতভাবে অনেক বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত.....একটি ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া এক অতি উগ্র ধরনের হ্রাসবৃদ্ধি। অপেক্ষাকৃত অনুগ্র ধরনের অনেক রকমের হ্রাসবৃদ্ধির উদাহরণ দেওয়া যায়। .....এই ধরনের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বোর বর্ণিত শক্তিস্তরের সামান্য তারতম্য হয়। ....এই শর্তগুলি মানলে নিঃসৃত আলোর কোয়ান্টাম আপতিত আলোর কোয়ান্টামের তুলনায় অবস্থা অনুযায়ী কমে বা বাড়ে। অপনেয় রাসায়নিক বিক্রিয়া যেমন ভাবে দেখান হয় সেইভাবে লিখলে দাঁড়ায়

অণু	+	**বিকিরণ**	⇔	**অণু**	+	**বিকিরণ**
(সাধারণ অবস্থা)		(উচ্চ কম্পাংক)		(উত্তেজিত অবস্থা)		(নিম্ন কম্পাংক)
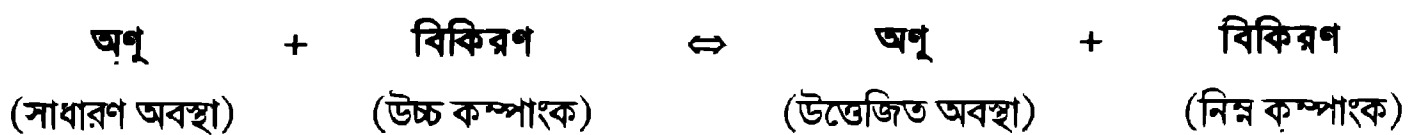
যেহেতু পরমাণু ও অণুদের সম্ভাব্য শক্তিস্তর অনেক.....উপরের রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিক্ষিপ্ত (রামন) বিকিরণের বর্ণালিতে অনেক নতুন রেখা দেখার সম্ভাবনা আছে।"

রামন তাঁর আবিষ্কারের ব্যবহারিক প্রয়োগ কি হতে পারে খুব তাড়াতাড়ি তা বুঝতে পারেন,

> **"দৃশ্য আলো ও অতিবেগুনি রশ্মির জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে আলোর বিক্ষেপণ দিয়ে প্রায় পুরো অবলোহিত অংশে ফটোগ্রাফ নেওয়া যায়.....বেনজিনের মধ্যের কার্বন-বন্ধকের কম্পন অতি নিখুঁত ভাবে মাপা যায়, যা অন্য কোন ভাবে যায় না।**

অণুদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তিস্তর অনুযায়ী নিঃসৃত বিকিরণের কম্পাংক কম হয় এবং এগুলি বর্ণালির অবলোহিত অংশে পড়ে—নিম্ন কম্পাংক (দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য) ও নিম্ন শক্তির। এই নিম্ন কম্পাংকের বিকিরণ সাধারণত ধরা পড়ে না। এই নিম্ন কম্পাংকগুলি উচ্চতর কম্পাংকদের সঙ্গে যুক্ত হবার পরও দৃশ্য পাল্লার মধ্যেই থাকে। যদি আপতিত
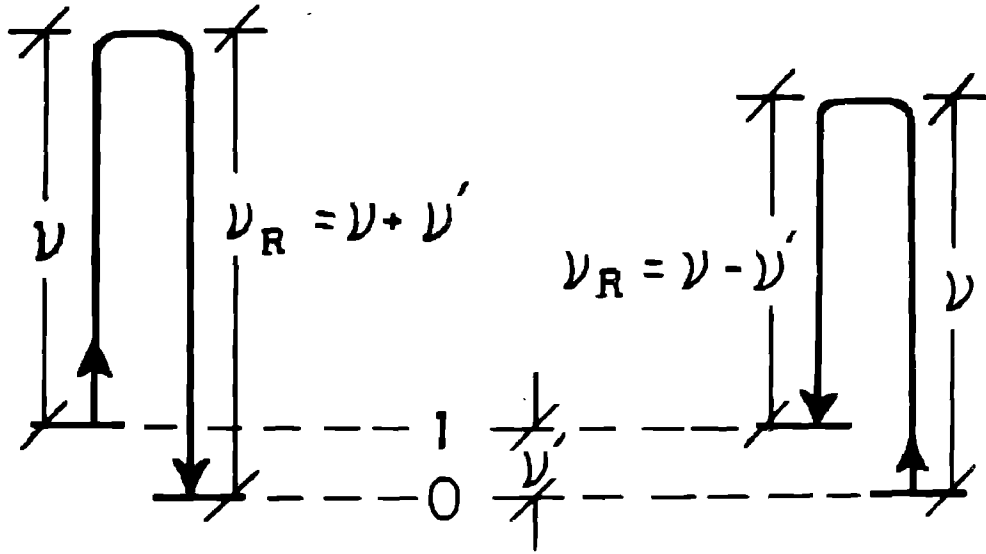
চিত্র: 1 রামন বিকিরণে স্টোকস (ডান হাতী) ও অ্যান্টি স্টোকস (বাঁ হাতী) শক্তিস্তর কম্পাংক দেখান হয়েছে।

চিত্রে অণুদের কম্পন শক্তিস্তরগুলি দেখান হয়েছে। 0 অর্থে সর্বনিম্ন শক্তিস্তর (গ্রাউণ্ড স্টেট) এবং 1 তার উপরের স্তর, শক্তির পার্থক্য $h\nu'$। উচ্চতর শক্তির স্তরগুলি খুবই কম অংশ নেয়, উচ্চশক্তিস্তরে অণুদের সংখ্যা খুব কম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে 0 স্তরে যে সংখ্যক অণু থাকে 1 স্তরে অণুর সংখ্যা তার থেকে $e^{-h\nu'/kT}$ কম। k বোল্টজ্‌ম্যান ধ্রুবক এবং T কম্পমান অণুদের তাপমাত্রা। আপতিত ফোটনগুলি, যাদের প্রত্যেকটির শক্তি $h\nu$, অণুগুলিকে কিছুক্ষণের জন্য (10^{-9} সেকেণ্ড) উচ্চশক্তি স্তরে তুলে দেয়। সেখান থেকে অণুগুলি রামন রশ্মি বিকিরণ করে। যদি অণুগুলি প্রথম অবস্থায় 0 শক্তিস্তরে থাকে তবে বিকিরণের কম্পাংক হবে $\nu_R=\nu-\nu'$ আর যদি 1 শক্তিস্তরে থাকে তবে হবে $\nu_R=\nu+\nu'$।

স্টোকস দেখিয়েছিলেন যে প্রতিপ্রভায় নিঃসৃত আলোর কম্পাংক কমে যায়। তাই $\nu-\nu'$ রেখাগুলিকে বলা হয় স্টোকস রেখা এর $\nu+\nu'$ কে এন্টি স্টোকস রেখা। এদের তীব্রতার অনুপাত হল :

স্টোকস $(\nu-\nu')^4 : (\nu+\nu')^4\, e^{-h\nu'/kT}$ এন্টি স্টোকস

ν' যত ছোট হতে থাকে দুটির তীব্রতার পরিমাণ সমান সমান হতে থাকে। যখন উচ্চতর শক্তিস্তর শোষিত হয়ে 0 ও 1 স্তরকে যুক্ত করতে পারে তখনই রামন রেখার উদ্ভব হয়। ঘূর্ণন বা ঘূর্ণন-কম্পন ধরনের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য।

ফোটন হয় $h\nu$ এবং অণুতে শোষিত ফোটন হয় $h\nu'$, তবে বিক্ষেপিত ফোটনের শক্তি হবে $h(\nu-\nu')$ এবং কম্পাংক $\nu-\nu'$। যদি ν' νর তুলনায় ছোট হয় এবং ν বর্ণালির দৃশ্য পাল্লার মধ্যে থাকে, তবে $\nu-\nu'$ ও দৃশ্য বর্ণালি বা তার কাছাকাছি থাকবে। বিক্ষেপক অণু তাদের পরিচয় চিহ্ন (ν') বিক্ষেপিত বিকিরণের ($\nu-\nu'$) মধ্যে রেখে দেয়। তার থেকে তাদের উপাদান ও গঠনবিন্যাস জানা যায়। ঐ একই পদ্ধতিতে যদি বিক্ষেপক অণু $h\nu'$ শক্তি জোগায় তবে বিক্ষেপিত বিকিরণের শক্তি হয় $h(\nu+\nu')$ এবং কম্পাংক হয় $(\nu+\nu')$। নীচে চিত্র 1-এ বিক্ষেপিত রামন আলোর কম্পাংকের হ্রাস ও বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

অণুগঠন জানার জন্য অত্যন্ত নিখুঁত পরিমাপের যে স্বপ্ন রামন দেখেছিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই তা সফল হয়।

দশম অধ্যায়

বিজ্ঞানীর প্রধান কাজ

কলকাতায় থাকার সময় রামনের বাসা ছিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ঠিক পেছন দিকে একটা বাড়ীতে। সুতরাং যখন খুশী পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে বেরোতে পারতেন। অ্যাসোসিয়েশন এসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি শ্রী আশুতোষ দে বাড়ীতেই থাকতেন। তাই সময় অসময় যখন দরকার তিনি রামনের হাতের কাছেই হাজির থাকতেন। রবিনসন ক্রুশোর ম্যান ফ্রাইডের মত আশুবাবু ও ছিলেন রামনের বিশ্বস্ত অনুচর। রামদাস বলেছেন অনেক সময় পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি টেবিলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরের দিন ভোরে হতচকিত আশুবাবু তাঁকে জাগিয়ে দিয়েছেন। 1927 সালে ডিসেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায় রামন তাঁর অফিস ঘরে বসে ছিলেন সঙ্গে তাঁর দাদা (বিখ্যাত জ্যোতিপদার্থবিদ অধ্যাপক এস. চন্দ্রশেখরের বাবা) বসেছিলেন। এমন সময় দৌড়ে এসে ঢুকলেন কে. এস. কৃষ্ণান এবং জানালেন আর্থার কম্পটন ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এক্সরে বিকিরণের বিক্ষেপণ নিয়ে কাজের জন্য। রামন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন, বললেন, "ভালো খবর, সত্যি খুব ভালো। শোনো কৃষ্ণান এক্সরের বেলায় যা সত্যি আলোর ক্ষেত্রেও তা সত্যি হতে হবে। আমি সব সময় তা মনে করি। কম্পটন প্রভাবের অনুরূপ আলোরও প্রভাব থাকতে হবে। আমাদের প্রমাণ করতেই হবে, আমরা ঠিক পথেই চলেছি। প্রমাণ আমরা পাবই এবং সেই সঙ্গে নোবেল পুরষ্কার।"

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে রামন প্রভাবকে কম্পটন প্রভাবের অনুরূপ বলা যায় না। কম্পটন প্রভাবে উচ্চশক্তির (এক্সরে) তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ পরমাণু ঘিরে যে সব ইলেকট্রন থাকে তার সঙ্গে ধাক্কায় সবসময় ইলেকট্রনের শক্তি জোগায়। রামন প্রভাবে নিম্নশক্তির বিকিরণ (আলো) গোটা অণুর সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ায় অধিকাংশ অণুর শক্তি বৃদ্ধি করে, তার মধ্যে কিছুসংখ্যাক অণু তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ মাধ্যমে শক্তি হারায়।

যে ঘটনাটি বলা হ'ল তার থেকে বোঝা যায় কম্পটনের পুরষ্কার পাওয়ায় রামন কতটা অণুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তাঁর আত্মপ্রত্যয় কত দৃঢ় ছিল। তাঁর আত্মবিশ্বাসের কোন সীমা ছিল না, অনেক সময় তা দুঃসাহসের পর্যায়ে পৌঁছে যেত। বিশ্বাস করা কঠিন যে নোবেল পুরষ্কার ঘোষণার দুমাস আগেই তিনি স্টকহল্ম যাবার জন্য জাহাজের টিকিট করে রেখেছিলেন এবং এই যাত্রার জন্য কি কি অগ্রিম ব্যবস্থা করেছেন তা সকলকে বলতেন।

কিন্তু সাফল্য আকাশ ফুঁড়ে পড়ে না। রামন দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে শুরু করলেন। দ্রুতগতি কাজ এগিয়ে চলল। রামনের অধীনে আলোর বিক্ষেপণ নিয়ে গবেষণা অ্যাসোসিয়েশনে 1922 থেকে 1927 পর্যন্ত চলছিল। অবশ্য অন্যান্য বিষয়েও গবেষণা হ'ত, যেমন তড়িৎ ও চুম্বক জনিত দ্বি-প্রতিসরণ, তরল ও কেলাসে এক্সরের অববর্তন প্রভৃতি। তরলে এবং গ্যাসে তাপীয় গতিবেগের ও কম্পনের ফলে অণুগুলি স্বচ্ছন্দে সব দিকে সমানভাবে (সমদর্শ ভাবে) থাকতে পারে। তাই আলোর বিক্ষেপণের ক্ষেত্রে র‍্যালের তত্ত্বের যে বর্ণনা তার থেকে অনেক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আলোর বিক্ষেপণে ধ্রুবণ তলের একটি প্রভাব পড়ে। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে দড়ির কম্পনের মত আলোর বিকিরণের তড়িৎ-ভেক্টর যে তলে থাকে তাকেই ধ্রুবণ তল বলে। বিকিরকের ইলেকট্রনগুলির উত্তেজনার বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্রুবণ-তল পরিবর্তিত হতে থাকে।

এই সম্পর্কিত নানা প্রভাব বিষয়ে রামনাথন ও আরও অনেক গবেষক বিভিন্ন চাপ ও তাপমাত্রায় বিস্তারিত পরীক্ষা করেছিলেন। কৃষ্ণান প্রমাণ করেন বিকিরকের অণুগুলির রাসায়নিক গঠনের উপর নির্ভর করে আলোর বিষমদৈশকতা। রামচন্দ্র রাও এর কাজ ছিল লম্বাকৃতি অণু দিয়ে তৈরি বস্তুর থেকে বিক্ষেপণ দেখা। তিনি বিভিন্ন তাপমাত্রায় এই পরীক্ষা চালান। বিক্ষেপক মাধ্যমে আপতিত রশ্মির তীব্রতার তুলনায় গৌণ র‍্যালে বিক্ষেপণের রেখাগুলি অতি ক্ষীণ, তার থেকে ক্ষীণতর ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (রঙের) বিকিরণ প্রথম দেখতে পান রামনাথন তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। রামনাথন যে বিকিরণ দেখতে পান তার তীব্রতা র‍্যালে বিকিরণের তীব্রতার কয়েক শতাংশ মাত্র। স্বভাবতই এই (রামন) বিকিরণ গৌণ র‍্যালে বিকিরণের থেকে পৃথক ভাবে দেখা যাবে যদি মুখ্য রশ্মি একবর্ণী হয়। মুখ্য রশ্মিতে যদি আলোর সব রং বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালি থাকে তবে গৌণ রশ্মিতে ও রামন রশ্মিতেও চিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালি থাকবে এবং রেখাগুলি এমন মিশে যাবে যে তাদের আলাদা করে চেনা যাবে না। তাই রামন রশ্মি দেখাবার জন্য চাই বিশুদ্ধ একবর্ণী তীব্র আলোর উৎস। সূর্য রশ্মির সামনে রঙীন কাঁচ (বা ফিল্টার) বসিয়ে একবর্ণী আলো তৈরি করে ভেংকটেশ্বরন বর্ণালি ক্ষীণ রশ্মির ফটোগ্রাফ করার চেষ্টা করে সফল হননি। উচ্চমাত্রায় বিশুদ্ধ গ্লিসারিন ব্যবহার করে 1927 সালে রামনের সহকর্মীরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন বিক্ষেপণে গৌণ নীল রশ্মি ছাড়াও বিক্ষেপক থেকে মোটামুটি তীব্র অধিকতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সবুজ রশ্মি বেরুচ্ছে। সৌভাগ্য বলতে হবে যে বিক্ষেপক হিসেবে ব্যবহৃত গ্লিসারিনের আনবিক গঠনই এমন যা রামন বিকিরণের বিশেষ উপযোগী। এরপর রামন ও কৃষ্ণান অন্য ধরনের বিক্ষেপক দিয়ে পর পর পরীক্ষা করে চললেন। সরু একবর্ণী রঙ পাবার জন্য সূর্যের আলোর সামনে নানান ধরনের ফিল্টার বসান হল। স্বল্প ফোকস দূরত্বে লেন্স সমেত টেলিস্কোপ ব্যবহার করা হল একবর্ণী রশ্মির তীব্রতা বাড়ানোর জন্য। বিক্ষেপক

ও দর্শকের মধ্যে আলোর ফিল্টার দেওয়া হল গৌণ বিক্ষেপিত (র‍্যালে) রশ্মি যতদূর সম্ভব কমিয়ে রামন রশ্মির মূল রঙটি দেখা যায়। দেখা গেল এই রশ্মি অতি মাত্রায় ধ্রুবিত। কৃষ্ণান জৈবযোগদের গ্যাস নিয়েও পরীক্ষা করেন এবং তার জন্য বিকিরণের ধ্রুবণের মাত্রা নিরূপণ করেন। এর পর দর্শানী কাচ ও বরফ প্রভৃতি কঠিন বস্তুর উপর পরীক্ষা চালান। কোন সন্দেহ নেই যে বৌবাজার স্ট্রীটে অ্যাসোসিয়েশনের বাড়ীর চারপাশের লোকেরা অবাক হয়ে ভাবত যে পাগলের দল চাঁই চাঁই বরফ দিয়ে কি করছে।

এই ধরনের পরীক্ষামূলক গবেষণার আবিষ্কারে চারটি বিশিষ্ট ধাপ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে থাকে একটি অনির্দিষ্ট প্রত্যাশা ও অন্তর্দৃষ্টি, তার পর আসে নতুন ফলাফল সঠিকভাবে সনাক্তকরণ, উদ্ভূত সমস্যার জাল ভেদ করা এবং সবশেষে সম্পূর্ণ উপলব্ধি। এটাই যথেষ্ট নয়, এরপর থাকে নিজের উপলব্ধি অন্যদের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করা ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি। একটি বিশেষ রঙের ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মি বিকিরকের ওপর পড়ে বিক্ষেপণ হল, তাতে আগে থেকে জানা মুখ্য রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে অতি ক্ষীণ আর একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করল যা বিকিরক মাধ্যমের গঠনের ধর্মের সঙ্গে জড়িত। ভিন্ন রঙের ক্ষীণ আলো চোখে দেখা স্থূল পরীক্ষা। কত ভালো হত যদি ঐ ক্ষীণ আলোর বর্ণালির ফটোগ্রাফ তোলা যেত। কারণ পেপার লেখার সময় পুরো ব্যাপারটা ভাষায় বর্ণনা করতে হত। কিন্তু সেই সঙ্গে বর্ণালিতে গৌণ ও রামন রেখার ফটোগ্রাফে পাশাপাশি দেখাতে পারলে। তাই রামন ও কৃষ্ণান উঠে পড়ে লেগে শেষ পর্যন্ত এই বর্ণালি-চিত্র গ্রহণ করলেন। ফিল্টার করা সূর্যের আলো উৎস হিসেবে না ব্যবহার করে মার্কারি ভেপার ল্যাম্প মুখ্য আলোর উৎস হিসেবে ব্যবহার করাতেই এটা সম্ভব হল। এই তীব্র মার্কারি ভেপার ল্যাম্প ব্যবহার করার ফলে মুখ্য রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যর (বা গৌণ বিক্ষেপিত র‍্যালে বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য) থেকে বড় ও ছোট দৈর্ঘ্যের একাধিক রামন বিকিরণ ধরা সম্ভব হয়েছিল। এই উজ্জ্বল আলোর উৎস ব্যবহার করার ফলে রামন বিকিরণে ধ্রুবণও ধরা পড়ে।

অগ্রাধিকার বিষয়ে রামন অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। অগ্রাধিকার হারালে সব বৃথা। আট মাসের মধ্যে বৌবাজার স্ট্রীট থেকে তিনি দশটি পেপার ছাপতে পাঠিয়েছিলেন। একটি ছাপা হয় 1928-এর এপ্রিল সংখ্যায় ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্সে তাঁর নিজের[1] নামে এবং পরেরটি কৃষ্ণানের[2] সঙ্গে যুগ্মভাবে ঐ একই সংখ্যায় প্রথমটির পরের পাতা থেকে। অবশ্য

[1] সি. ভি. রামন : *ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স,* 2, 387 (1928)। এটি বাঙ্গালোরে 16 মার্চ, 1928-এ দেওয়া বক্তৃতা।

[2] সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান : *ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স,* 2, 397 (1928) 7 মে, 1928-এ প্রেরিত।

এর আগেই 16 ফেব্রুয়ারী 1928-এ রামন ও কৃষ্ণানের যুগ্মনামে একটি চিঠি লণ্ডনের নেচার পত্রিকায় পাঠানো হয় এবং সেটি ছাপা হয় 31 মার্চ 1828-এ[3]। পরেরটি রামনের[4] নিজের নামে পাঠানো হয় 8 মার্চ। তারও পরেরটি যুগ্মনামে[5] 22 মার্চ। এরপরের যুগ্মনামের চিঠিটি[6] 15 মে'র, পঞ্চম[7] যুগ্মনামে চিঠি 14 জুন, ষষ্ঠ[8] 5 জুলাই এবং সপ্তমটি[9] 18 অক্টোবর 1928 তারিখে।

বারো পৃষ্ঠার একটি যুগ্ম পেপার[10] 7 আগস্ট 1928 সালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠানো হয়। তখন রামন নিজে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য। সোসাইটির প্রসিডিংসে 1929 সালের জানুয়ারী মাসে এটি ছাপা হয়। রাদারফোর্ডের বার্ষিক ভাষণের পরই এটাই ছিল প্রথম পেপার।

রামদাস[11] লিখেছেন যে রামন পেপার লেখার সময় অত্যন্ত যত্ন নিতেন। কিন্তু লেখা শেষ হলে হুড়োহুড়ি করে ট্যাক্সি করে ছুটতেন জেনারাল পোস্ট অফিসে, দরকার হলে লেট ফি দিয়ে লেখাটি ডাকে দিতেন। ভাবতে পারেন 1928 সালের 16 ফেব্রুয়ারী (ছাপা হয় 31 মার্চে) পাঠান পেপারটি পাঠাতে তিন মাস দেরি হলে মাণ্ডেলস্টাম ও ল্যাণ্ডসবার্গ এখন যার নাম রামন প্রভাব তাঁর আবিষ্কর্তা বলে বিবেচিত হতেন। সমসাময়িক বিজ্ঞানে এই ধরনের 'ঘোড় দৌড়ের' পরিবেশ নিয়ে অনেক কথাই বলা যায়। এর ভাল মন্দ দুই আছে। লক্ষ্য করতে হবে যে রামন পরীক্ষার ফলাফল সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করার ব্যাপারে বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন। তাঁর সুবিখ্যাত পূর্বসুরী জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত, পরার্থী তিনি নিজের আবিষ্কারের পেটেন্ট নিতে ভুলে গিয়েছিলেন অথবা নিতে রাজী হন নি। রামন যা করেছিলেন তা তার মজ্জাগত। রামন জানতেন নিজের বক্তব্য অন্যের কাছে কি করে পৌঁছতে হয়। 1928 সালের 16 মার্চ বাঙ্গালোরে দক্ষিণ ভারত বিজ্ঞান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্বোধন করার সময় তিনি ভাষণ দেন 'এক নতুন বিকিরণ' বিষয়ে—এই রকম নামকরণই তখনকার কালের রীতি ছিল। সেখান থেকে কলকাতা ফেরার পর রাতারাতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে ছাপিয়ে হাজার

---

[3] সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান : *নেচার,* 121, 501 (1928)। এটি প্রথম ছাপা রিপোর্ট।

[4] সি. ভি. রামন : *নেচার,* 121, 619 (1928)।

[5] সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান, *নেচার,* 121, 711 (1928)।

[6] সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান, *নেচার,* 122, 12 (1928)।

[7] সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান, *নেচার,* 122, 168 (1928)।

[8] সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান, *নেচার,* 122, 278 (1928)।

[9] সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান, *নেচার,* 122, 882 (1928)।

[10] সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান : *প্রসিডিংস অফ দি রয়্যাল সোসাইটি* (11) 122, 23 (1928)।

[11] এল. এ. রামদাস, *জার্নাল অফ ফিজিক্স এডুকেশন,* 1, 1 (1971)।

হাজার কপি প্রবন্ধ পৃথিবীর নানান বিজ্ঞানীদের পাঠানো হয় 1928 সালের 31 মার্চের মধ্যে। সুতরাং এই দৌড়ে কোন ঘোড়া প্রথম যাচ্ছে সে সম্বন্ধে যেন কারো কোন সন্দেহ না থাকে। নেচার পত্রিকায় ত আগের মাসেই তিনি পেপার পাঠিয়েছেন তা সত্ত্বেও কেন তিনি এটা করতে গেলেন? এর উত্তর দেওয়া হবে বিংশ অধ্যায়ে।

1928 সালের ফেব্রুয়ারী মাসের 16 তারিখে প্রকাশিত নেচার পত্রিকায় যে চিঠিটি ছাপা হয়েছিল তা সংক্ষিপ্ততার একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নের মূল হিসেবে গণ্য সত্যেন্দ্রনাথ বোসের[12] চার পাতার ছোট্ট প্রবন্ধটি প্রশংসায় অনেকেই পঞ্চমুখ। কিন্তু রামন ও কৃষ্ণানের চিঠিটি নেচারের আধ পাতা কলমে মাত্র 51 লাইনের। এতে কোন অংক নেই এমন কি কোন সংকেতও নেই। বাইবেলের উপদেশ "বক্তৃতা ছোট করো এবং বক্তব্য অল্প কথায় বলো" কিন্তু 51 লাইনে এমন কিছু কি বলা সম্ভব যার বিনিময়ে নোবেল পুরস্কার পাওয়া যায়?

16 ফেব্রুয়ারী চিঠিতে ষাটটি তরলে রামন প্রভাব দেখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে সূর্যের আলো মুখ্য রশ্মির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে বর্ণালি বিচারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু বর্ণালি-চিত্র দেওয়া হয়নি। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সারাংশ একটি বাক্যে বলা আছে –

> ধূলিহীন তরল ও গ্যাসে বিক্ষেপণের ফলে প্রত্যেকটিতে ব্যপ্ত আলোর মধ্যে মুখ্য রশ্মির আলোক তরঙ্গের সমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো তো থাকেই, তার সঙ্গে থাকে পরিবর্তিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিক্ষেপিত বিকিরণ।

পরিবর্তিত বিক্ষেপিত বিকিরণের কারণ হিসেবে বলা হয়, 'সাধারণ অবস্থার হ্রাসবৃদ্ধি'। চিঠিটি সঙ্গে সঙ্গে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমেরিকার বিখ্যাত বর্ণালি বিজ্ঞানী অধ্যাপক আর. ডব্লু. উড নেচার পত্রিকায় নিম্নলিখিত কেবল[13] পাঠান :

> রামনের চমকপ্রদ, আশ্চর্য আবিষ্কার—তীব্র একবর্ণী আলো স্বচ্ছ বস্তুতে পড়ে পরিবর্তিত বিকিরণ বিক্ষেপণ করে—এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তা ছাড়া আবিষ্কারের বিভিন্ন দিক উন্নততর অ্যাপারেটাস ব্যবহার করে যাচাই করা হয়েছে।
>
> আমার মনে হয় দীর্ঘদিন ধরে অসীম ধৈর্য সহকারে রামন আলোর বিক্ষেপণ নিয়ে যে গবেষণা চালিয়েছেন তার পরিণতি এই অপূর্ব আবিষ্কার আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিষয়ে সব থেকে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ—অন্তত আজ পর্যন্ত যা জানা আছে তার মধ্যে।

1928 সালের 8 মার্চ যে চিঠিটি রামন শুধু নিজের নামে পাঠান তাতে মার্কারি ভেপার ল্যাম্প ব্যবহার করার কথা বলা হয়। বলা হয় যে বর্ণালি-চিত্র নেওয়া হয়েছে এবং দেখা গেছে যে হ্রাসপ্রাপ্ত কম্পাংকের নতুন রেখা সকল বস্তুর ক্ষেত্রে **একই স্থানে থাকে।**

---

[12] এস. এন. বোস : *জাইট্সক্রিফ্‌ট ফর ফিজিক* 26, 178-181 (1924)।

[13] আর. এস. কৃষ্ণান, *জার্নাল অফ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ*, সি. এস. আই. আর., নিউদিল্লি, 30, 2 (1971)।

শেষের উক্তিটি ঠিক নয়। 22 মার্চের চিঠিতে সেটা শুদ্ধ করা হয়। এই চিঠি যুগ্মনামে পাঠানো হয়েছিল। দেখলে মনে হয় কৃষ্ণানের সঙ্গে পরামর্শ করে না লিখলে, রামনের লেখায় ত্রুটি থাকত। এই চিঠির সঙ্গে প্রথম একটি বর্ণালি-চিত্র দেওয়া হয়—টলুইন থেকে বিক্ষেপণে একটি র‍্যালে রেখা এবং কয়েকটি রামন রেখা স্পষ্ট দেখান ছিল। এই চিঠিতেও আবার বলা হয় যে বর্ণিত প্রভাবটি আলোর ক্ষেত্রে কম্পটন বিভবের অনুরূপ। (এই বর্ণনা ঠিক নয় তা আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। র‍্যালে বিকিরণে-এই নতুন বর্ণালি রেখার উৎপত্তির কারণ হিসেবে বলা হয়,

> ধরে নেওয়া যায় যে আপতিত বিকিরণের একটি কোয়ান্টাম তরলের সমস্ত অণুগুলির থেকে অথবা তার এক অংশ থেকে বিক্ষিপ্ত হতে পারে, প্রথমটি হলে মূল তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও পরেরটি হলে বর্ধিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে।

আরও বলা হয়,

> কম্পাংক হ্রাসের পরিমাণ অণুদের অবলোহিত শোষণ রেখার কম্পাংকের প্রায় সমান এই তথ্যটি উপরোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন করে। তা ছাড়া দেখা গেছে যে **তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন সকল অণুদের ক্ষেত্রে এক নয়।**

রামন রেখার সত্যিকার ধর্ম বর্ণনা করে দ্বর্থ শূন্য চিঠি 15 মে, 1928 সালে লেখা হয়। এতে নতুন ফলাফল ব্যাখ্যায় অণু ও পরমাণুদের মিথষ্ক্রিয়ার প্রকৃতি বিষয়ে আইনস্টাইনের অনুমান ব্যবহার করা হয়। এই পত্রে জানানো হয় যে মুখ্য বা র‍্যালে বিকিরণের সমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছাড়াও বিক্ষেপণে বেশ কিছু বর্ধিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং কিছু হ্রস্ব তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখা গেছে। আইনস্টাইনের মতে বিকিরণের সঙ্গে বস্তুর মিথষ্ক্রিয়া তিনটি ধরনের হতে পারে: (1) বিকিরণের শক্তির ঘনাংকর অনুপাতে বিকিরিত শক্তি বস্তুতে শোষিত হতে পারে, (2) শক্তির ঘনাংকের অনুপাতে বস্তু থেকে শক্তি নিঃসৃত হতে পারে, এবং (3) বস্তু থেকে স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণ শক্তিঘনাংক যাই হোক না কেন। পরমাণু বা পরমাণু নিউক্লিয়াসের অস্থিরতার জন্য শেষোক্ত প্রক্রিয়া ঘটে থাকে এবং রামন বিকিরণের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। সুতরাং আমরা কেবল প্রথম দুটি প্রক্রিয়ার—শোষণ ও উত্তেজিত অবস্থায় নিঃসরণ—আলোচনা করব। যদি এক পরমাণু গোষ্ঠী (পরমাণু, আয়ন বা অণু) শক্তি স্তরের সর্ব নিম্নে থাকে তবে তা কেবল শক্তি শোষণ করতে পারে এবং করে শক্তির উচ্চস্তরে ওঠে। পরমাণু গোষ্ঠীটি যদি উত্তেজিত অবস্থায় থাকে তা হলে তার পক্ষে দুভাবেই শক্তি বিনিময় সম্ভব। এই দুই প্রক্রিয়া কি ভাবে হতে পারে তার সম্ভাব্যতা বিষয়ে নির্দিষ্ট তত্ত্ব আছে। সুতরাং আলোর সঙ্গে পরমাণু গোষ্ঠীর সংঘাতে এই গোষ্ঠীদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে, হ্রাস ও হতে পারে। আপতিনি আলোর কোয়ান্টাম থেকে শক্তি শোষণ করার ফোটনের শক্তি হ্রাস পায়, ফলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়ে এবং কম্পাংক কমে। এর বিপরীত প্রক্রিয়া-ফোটনের শক্তি

বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা সমান, সুতরাং উচ্চতর কম্পাংকের রামন রেখাও দেখা যায়। এর আগে ম্যাক্সওয়েল ও বোল্টম্যান প্রমাণ করেন যে উচ্চতর শক্তিতে থাকা পরমাণু বা অণুর সংখ্যা নিম্নশক্তিতে থাকা পরমাণু বা অণুদের তুলনায় অনেক কম। সেইজন্য শক্তি বিনিময়ের ক্ষেত্রে উচ্চতর শক্তিতে উন্নীত হওয়া ফোটন সম্বলিত পরমাণুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এই তথ্যটি রামন ও কৃষ্ণান তাদের চিঠিতে জানান। আরও বেশি সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি জোগাড় করে, তাঁরা বর্ণালি চিত্রে মুখ্য আলোক রশ্মির তুলনায় উচ্চতর কম্পাংকের ক্ষীণতর রেখাগুলি দেখাতে সম্ভব হন। রামন প্রভাব ও কম্পটন প্রভাবের এইটাই পার্থক্য। কম্পটন প্রভাবে এক্স-রশ্মি পরমাণুর আলগা করে বাঁধা ইলেকট্রনদের সঙ্গে ধাক্কায় ইলেকট্রনগুলি মুক্ত করে ও নিজ শক্তির একাংশ ইলেট্রনগুলিতে সঞ্চারিত করে। তা ছাড়া কম্পটন প্রভাব বিক্ষেপণকারী বস্তুর উপর নির্ভর করে না এবং হীনশক্তি এক্সরের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বিক্ষেপণের দিক ও বিক্ষেপণ কোণের উপর নির্ভরশীল।

রামন প্রভাবে শক্তি বিনিময় ঘটে বস্তুর মধ্যে। 1953 সালে রামন প্রভাবের রজত জয়ন্তী উৎসবের সময় আইনস্টাইন খবরের কাগজের প্রতিনিধির কাছে এক বাণী দিয়েছিলেন,

> সি. ভি. রামনই প্রথম বুঝতে ও দেখাতে পেরেছিলেন ফোটন বস্তুর অভ্যন্তরে আংশিকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। আমরা বার্লিনে ফিজিক্স কলোকুয়ামে বক্তৃতা শুনছিলাম, সে দিন এই আবিষ্কারের কথা শুনে আমার মনে যে গভীর আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল সে কথা আজও মনে পড়ে।

14 জুন, 1928-এ লেখা পরের চিঠিতে রামন ও কৃষ্ণান বিক্ষিপ্ত বিকিরণে ধ্রুবণের কথা জানান। যেহেতু পরমাণু গোষ্ঠীরা একটি বিশিষ্ট জ্যামিতিক আকার নিয়ে বৈদ্যুত ভেক্টরের সঙ্গে সংঘাত করে তাই তারা বৈদ্যুত ভেক্টরের উপর তার বিন্যাসের সর্ত আরোপ করে। ফলে বিক্ষিপ্ত আলোর কিছু অংশ ধ্রুবিত হয়। (কম্পটন প্রভাবের ক্ষেত্রেও ধ্রুবণ দেখা যায়)। মনে রাখতে হবে যে পরমাণুর অভ্যন্তরে সমান সংখ্যক পজিটিভ ও নেগেটিভ আধান থাকার জন্য পরমাণু গোষ্ঠী অনাহিত হলেও পজিটিভ ও নেগেটিভ আধানগুলি নিজেদের থেকে অনেক দূরে দূরে থাকে। যেমন একটি পজিটিভ ও একটি নেগেটিভ আধান দূরে দূরে থাকলেও বিকিরণের বৈদ্যুত ভেক্টরের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া করতে পারে। এ ব্যাপারে দুটি বিদ্যুৎ আধান দুটি চুম্বক মেরুর মত এবং উভয়ের নিজেদের মধ্যে দূরত্বের সমানুপাতিক দ্বিমেরু-ভ্রামক থাকে। আরও জটিল অণুগুলিতে তিনটি স্থানিক অক্ষ ঘিরে ভিন্ন ভিন্ন ভ্রামক থাকে।

সবশেষে 1928 সালে 18 অক্টোবর প্রেরিত ও নেচারের 8 ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রে এই দুই ভারতীয় বিজ্ঞানী পরমাণু গোষ্ঠীর ঘূর্ণন-শক্তির সঙ্গে আলোক কণার শক্তি বিনিময়ের ফলে বর্ণালি-চিত্রে রামন রেখার 'ডানা' গজানোর কথা লেখেন।

1929 সালে প্রসিডিংস অফ দি রয়্যাল সোসাইটির জানুয়ারী সংখ্যায় সমগ্র কাজের ফলাফল বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়। এটা পেপারে প্রথম পর্ব এবং অন্যান্য পর্ব পরে

প্রকাশিত হবে বলা থাকলেও কোন অজ্ঞাত কারণে আর কোন পর্ব ছাপা হয়নি। কৌতূহলের বিষয় এই পেপারে কম্পটন প্রভাবের সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা বলা হয়নি। এমনকি এই প্রভাবের কোন উল্লেখই নেই।

পশ্চিম দেশগুলির বৈশিষ্ট্যই হল যে কোন নতুন ব্যাপার আবিষ্কার হলে তৎক্ষণাৎ গবেষকের দল নানান শাখায় প্রয়োগ করে এর যথার্থ্য যাচাই করে দেখেন। রামন প্রভাব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত বর্ণালিবিদরা এই কাজে নামেন। আমরা আমেরিকায় উড এবং ফ্রান্সে ক্যাবান্নাসের কাজের কথা আগে বলেছি। লক্ষ্য করার বিষয়ে যে 1928 সালের গোড়ায় ক্যাবান্নাস ও ডাউরে[14] তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের প্রভেদ দেখতে পান নি। প্রিংসেম ও রোজেন[15] কয়েকটি জৈব যৌগ পরীক্ষা করে দেখান যে প্রত্যেকটি রামন রেখার অনুষঙ্গী একটি অবলোহিত কম্পাংক থাকে তবে এর বিপরীত সব সময় নাও হতে পারে। গারল্যাক[16] বর্ণালি রেখার প্রস্থ মাপেন। জার্মানিতে ব্রিকার[17] ঐ একই বছরে বিভিন্ন জৈব তরল-বিক্ষেপক থেকে রামন রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছাড়া তাদের তীব্রতাও মাপেন। আমেরিকার উইলিয়ামস ও হল্যানদের[18] এসিটোনে তেরটি রেখার ফটো তোলেন এবং এদের সঙ্গে অবলোহিত নিঃসরণের সম্পর্ক নির্ধারিত করেন। মার্কারি আর্কের বদলে হিলিয়ম ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করে উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে উড[19] আদি অ্যালকোহলের এবং বেনজিনের অনুকম্প যৌগদের বর্ণালি পান। ক্রমে ক্রমে রামন প্রভাব বর্ণালিবিদদের কাজ হয়ে উঠল।

এ সবই ঘটে এক বছরের মধ্যে এবং তাতে বোঝা যায় কি দ্রুতগতিতে গবেষণা এগিয়ে চলে পশ্চিমের দেশগুলিতে।

---

[14] জে. ক্যাবান্নাস এবং পি. ডাউরে : *কঁতে রেঁদাস* 186, 1533 (1928)।

[15] পি. প্রিংসেম ও বি রোজেন : *জাইটস্ক্রিফ্‌ট ফ্যর ফিজিক*, 50, 741 (1928)।

[16] ডব্লু. গারল্যাক : *এনাল ডার ফিজিক*, 1.2, 301 (1929)।

[17] সি. ই. ব্রিকার : *জাইটস্ক্রিফ্‌ট ফ্যর ফিজিক*, 50, 781 (1928)।

[18] জে. ডব্লু. উইলিয়ামস ও এ. হল্যানদের : *প্রসিডিংস ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস*, 15, 421 (1929)।

[19] আর. ডব্লু. উড : *ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন*, 7, 858 (1929)।

একাদশ অধ্যায়

সম্মান প্রাপ্তি

শেক্সপিয়রের ফলস্টাফ প্রশ্ন করেছিল, 'সম্মান কি?' তারপর সে নিজেই উত্তর দিয়ে বলেছিল এটি একটি কথা মাত্র, অর্থাৎ হাওয়া[1]! বিখ্যাত ভক্তি বা খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের সম্মান প্রদানে তাঁদের কিছু উপকার হয় কিনা তাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তাঁদের সম্মান লাভে অন্যেরা অণুপ্রাণিত হয় ঠিকই তবে প্রাপকের খুব একটা লাভ হয় না। সত্যি বলতে কি এতে তাঁদের মন বিক্ষিপ্ত হয় অথবা অহংকার বাড়ে, ফলে কাজের প্রেরণা শুকিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আইনস্টাইন প্রায়ই এই নিয়ে অনুযোগ করতেন যে তাঁর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগের ফলে তাঁর কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু সম্মানের বর্ণনা না দিলে কোন মহৎ বিজ্ঞানীর জীবনী সম্পূর্ণ হয় না। অগত্যা আমরা রামনের প্রাপ্ত সম্মানের তালিকা প্রস্তুত করছি।

রামন যখন ছাত্র তখন ডক্টরেট ডিগ্রি করার এখনকার মত রেওয়াজ ছিল না। তখনকার দিনে পি এইচ ডি গাইড বলতে যা বোঝায় সেরকম শিক্ষক ভারত বর্ষে ছিলেন না বললেই হয়। শিক্ষার সর্বোচ্চ সোপান ছিল এম এ ডিগ্রি। রামন 1922 পর্যন্ত শুধুই এম এ ছিলেন। সেই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি এস সি উপাধি দেয়। তখনও তিনি প্রসিদ্ধ হন নি। পরে ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে—তার মধ্যে আছে বোম্বাই, মাদ্রাজ, বেনারস, এলাহাবাদ, পাটনা, লখনৌ, ওসমানিয়া, মহীশূর, শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর এবং ঢাকা (অবিভক্ত ভারতের)। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, অনেক পরে, 1964 সালে তাঁকে সাম্মানিক ডি এস সি ডিগ্রি অর্পণ করে। উপাচার্য সি. ডি. দেশমুখ খুব আবেগের সঙ্গে ভাষণটি পাঠ করেন। এইচ. জি. ওয়েলস যেমন 70 বছর বয়সে থীসিস লিখে ডিগ্রি অর্জন করেন রামনের পক্ষে তা করার প্রয়োজন ছিল না।

1921 সালে রামন প্রথম ইউরোপ যান। তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করতে যাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় তিনি প্রথম প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। সমুদ্রপথে ফেরার সময় তিনি সমুদ্রের নীল রঙের বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন। পরে নোবেল পুরস্কারের ভাষণে তিনি সোৎসাহে এই সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দেন। এই

[1] *হেনরি IV*, পার্ট I, V (i)।

জলই তাঁকে নোবেল পুরস্কারজয়ী কাজটির প্রেরণা দেয়। 1924 সালে তিনি ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দা কালটিভেশান অফ সায়েন্সের তরফ থেকে কানাডা ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রিত হন। কানাডায় বিজ্ঞানীদের সম্মেলনে তিনি ভাষণ দেন। তাঁর বিশেষ বিষয় আলোর প্রক্ষেপণ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন টোরন্টোতে। সেই বছরই লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করে। তখন তাঁর বয়স 36, এর আগে যে তিনজন ভারতীয় এই সম্মানে ভূষিত হন তাঁরা হলেন 1841 সালে এ. সি. ওয়াডিয়া, 1918 সালে 31 বছর বয়সে এস. রামানুজন এবং জগদীশচন্দ্র বসু অনেক দেরীতে 62 বছর বয়সে 1920 সালে। পরে অবশ্য যে কোন সময়ে অন্তত চার থেকে ছয়জন ফেলো জীবিত থেকেছেন যদিও অনেক যোগ্য ভারতীয় বিজ্ঞানী কেন বাদ পড়েছেন এটা ভেবে অনেকেই অবাক হন।

কানাডা থেকে রামন যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আর. এ. মিলিকানের আমন্ত্রণে তিনি চার মাস ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে ভিজিটিং প্রোফেসর হিসেবে কাটান। এ ছাড়া চিনি ফ্রাংকলিন ইনস্টিটিউটের শতবার্ষিকী উৎসবেও যোগদান করেন। পরে এই প্রতিষ্ঠান তাঁকে পদক দিয়ে সম্মানিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময় তিনি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও তখনকার শিক্ষাপ্রণালীর উপর বক্তৃতা দেন। পুরাতন ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে আগ্রহ তাঁর পারিবারিক সূত্রে পাওয়া। দেশে ফেরার অল্পকালের মধ্যেই 1925 সালে তাঁকে আবার ইউরোপ যেতে হয়—রাশিয়ার বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির দ্বিশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে উৎসবে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

পদার্থবিদ হিসাবে নিজের শক্তি সম্পর্কে যদি বা কিছু সন্দেহ তাঁর মনে থেকে থাকে এইসব বিদেশ সফরগুলি তা রামনের মন থেকে একেবারে মুছে দিতে পেরেছিল। রামনের চরিত্র ছিল ইস্পাতের মত নমনীয় এবং সহকর্মী ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপে তা আরও দৃঢ় করে তুলেছিল। পাণ্ডিত্যের সত্যকার মান নির্ধারিত করল এইসব বিদেশ সফর। হেলম্‌হোলৎজ যেমন বলেন 'দু-একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার পর লোকের মূল্যবোধ ও উচ্চাশা চিরকালের জন্য বদলে যেতে পারে।' এই জাতীয় কিছু বলেছিলেন তিনি।

1930 সালে নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হবার আগেই রামন বিশ্বে বর্ণালি বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে উড[2] ডিকিনসন ও ডিলন[3]; জার্মানীতে প্রিংসেম[4]

---

[2]আর. ডব্লু. উড : *ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন*, 6, 1282 (1928); 7, 858 (1929)। দশম অধ্যায়েও উদ্ধৃত করা হয়েছে।

[3]আর. জি. ডিকিনসন ও আর. টি. ডিলন : *ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস*, 15, 334 (1929)।

[4]পি. প্রিংসেম ও বি. রোজেন : *জাইটস্ক্রিফ্‌ট ফর ফিজিক*, 50, 741 (1928) দশম অধ্যায়েও উদ্ধৃত হয়েছে।

বি. রোজেন[4], গারল্যাক[5], শেফার[6], ব্রিকার[7] ও মেয়ার[8]; ফ্রান্সে ক্যাবান্নেস[9, 11] ও দরে[10, 11], ইতালিতে রোসি[12] ও এফ রসেটি[13], জাপানে নিসি[14] এবং কানাডায় ম্যাকলেনন ও ম্যাকলিয়ড[15] রামন ও কৃষ্ণানের 1928 সালের গোড়ার দিকের পেপার প্রকাশিত হবার এক বছরের মধ্যে রামন প্রভাবের উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ভারতে যারা রামনের সহকর্মী ছিলেন তাঁরা তো অসংখ্য পেপার লিখেছিলেন। এইসব পেপারগুলিই লেখা হয় রামনের সিদ্ধান্তের সমর্থনে বা তার সিদ্ধান্তকে আরও প্রসারিত করে। তাঁরা যে সকলেই এই বিষয়টি বেছেছিলেন তাকে মোটেই কাকতালীয় বলা যায় না। তাই যখন ফ্যারাডে সোসাইটি 1929 সালে ব্রিস্টলে অণুর বর্ণালি সম্পর্কে আলোচনা সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নেন তখন খুব যুক্তিসম্মত ভাবেই তার উদ্বোধনে রামনকে আমন্ত্রণ জানান হয়।

পরের বছর (1930) তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। এই প্রথম একজন অশ্বেতকায় এই গৌরব অর্জন করলেন। 1928 এর গোড়ার দিকে রামন ও কৃষ্ণানের পেপারগুলি প্রকাশিত হবার পর সোভিয়েত রাশিয়ার ল্যাণ্ডসবার্গ ও মেণ্ডেলস্টাম[16] এক জার্মান পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এঁরা অবশ্যই রামন ও কৃষ্ণানের আগের কাজের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। মার্কারি ল্যাম্প থেকে আলো কোয়ার্জ ও অন্যান্য কেলাসের মধ্যে পাঠিয়ে মূল রশ্মি জনিত নিঃসরণ রেখার দু পাশে লালের দিকে সরা ও বেগুনির দিকে সরা (তথাকথিত অ্যান্টি-স্টোকস) গৌণ রেখা তারা আবিষ্কার করেছেন বলে দাবী করেন। গৌণ রশ্মিদের সরণ যে কেলাসগুলির ভেতরের কম্পনজনিত কম্পাংকের সঙ্গে সম্পর্কিত, এটা তারা ঠিকই অনুমান করেছিলেন।

নোবেল কমিটি কেন ভারতীয় ও রাশিয়ানদের যুগ্মভাবে পুরস্কারটি দিলেন না? সম্ভবত এর প্রধান কারণ ভারতীয়দের কাজের বিষয়টি বোঝার দিক দিয়ে, বৈচিত্র্যে এবং প্রসারতায়

---

[5] ডব্লু. গারল্যাক : *এনাল ডার ফিজিক,* 1.2, 301 (1929)। দশম অধ্যায় উদ্ধৃত।

[6] সি. শেফার : *জাইটস্ক্রিফ্‌ট ফর ফিজিক,* 54, 153 (1929)।

[7] সি. ই. ব্রিকার : *জাইটস্ক্রিফ্‌ট ফর ফিজিক,* 50, 781 (1928)। দশম অধ্যায় উদ্ধৃত।

[8] ই. এইচ. এল. মেয়ার : *ফিজিক জাইটস্ক্রিফ্‌ট,* 30, 179 (1929)।

[9] জে. ক্যাবান্নেস : *কঁতে রেঁদো,* 187, 654 (1928); 188, 289 (1929)।

[10] পি. দরে : *কঁতে রেঁদো,* 187, 826 (1928); 187, 980 (1928); 188, 1605 (1929)।

[11] জে. ক্যাবান্নেস ও পি দরে, *কঁতে রেঁদো* 186, 1533 (1928)।

[12] বি. রোসি : *লিনসেই আটি,* 9, 319 (1929); *নুভো সিমেণ্টো,* (রিভিস্তা), 6, 61 (1929)।

[13] এফ. রসেটি : *ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি সায়েন্সেস,* 15, 234 (1929); 15, 515 (1929)।

[14] এইচ. নিশি : *ইম্পিরিয়াল অ্যাকাডেমি, টোকিও, প্রসিডিংস,* 5, 127, (1929)।

[15] জে. সি. ম্যাকলেনন ও জে. এইচ. ম্যাকলিয়ড : *রয়্যাল সোসাইটি অফ কানাডা টানস্যাক্সান,* 22, (তৃতীয় ভাগ), 413, (1928)।

[16] জে. ল্যাণ্ডসবার্গ ও এল. মাণ্ডেলস্টাম, *নাটুরভিস,* 16, 557, 772 (1928); *জাইটস্ক্রিফ্‌ট ফর ফিজিক,* 50, 769 (1928)।

বৃহত্তর ছিল, যদিও রাশিয়ানরা প্রথম ঘন পদার্থ (কোয়ার্টজ কেলাসে) এর প্রভাব লক্ষ্য করে। তবে স্টালিনের আমলে রাশিয়ানরা এক দিক দিয়ে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে বাইরে ছিল—এটাও একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। জারের সময়ে ইমিউনোলজিস্ট আই. আই. মেনিকফ 1908 সালের পুরস্কারটি এরলিকের সঙ্গে যুক্তভাবে লাভ করেন। তার 48 বছর পরে, 1956 সালে পুরস্কারটি আবার একজন রাশিয়ান পান, এটিও যুক্তভাবে ব্রিটেনের রসায়নবিদ হিনকোনউডের সঙ্গে। রাশিয়ানরা পদার্থবিদ্যায় প্রথম নোবেল পুরস্কার পান 1958 সালে। এটি লাভ করেন চেরেনকফ, ফ্র্যাংক ও ট্যাম কেরেনকফ্ বিকিরণ আবিষ্কার ও তার ভালোর জন্য। আবিষ্কারের 24 বছর পরে কিন্তু তাঁরা পুরস্কৃত হন। 1953 সালে স্টালিনের মৃত্যুর পরে শেষের দুটি পুরস্কার দেওয়া হয়। এই 48 থেকে 50 বছরের মধ্যে কোন রাশিয়ান কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করেন নি তা সম্ভব নয়। নোবেল কমিটি কেন কে. এস. কৃষ্ণানকে বাদ দিলেন সে বিষয়ে আমরা পরে মতামত প্রকাশ করব।

রামনের সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয়েরা গর্ব অনুভব করল। তখন মাঝে মাঝেই আইন অমান্য আন্দোলন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি চলছে। অথচ বৃটিশ শাসন তখন অব্যাহত। এই ঘটনায় ভারতবাসী যে বুদ্ধিমত্তায় শ্বেতকায়দের চেয়ে কম যায় না এই বোধ সকলকে উদ্দীপ্ত করল। এর আগে 1913 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। রামনের পুরস্কার প্রাপ্তিতে দেখা গেল সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দুই বিপরীত ধর্মী বিষয়ে যে দুজন অশ্বেতকায় সম্মানিত হয়েছেন তাঁরা দুজনেই ভারতীয়। প্রতীচ্যের দেশগুলি সাহিত্যে তেমন উন্নতি দেখাতে না পারলেও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিজ্ঞান ছিল প্রায় ইউরোপীয়দেরই একচেটিয়া। রামনের সাফল্য সেই কারণে আরও মহান, আরও উজ্জ্বল। তখনও গবেষণায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও দলগত কাজের যুগ আরম্ভ হয়নি। তখন একা কাজ করার সময়। যত বাধাই আসুক একার চেষ্টায় ও ব্যক্তিগত প্রতিভায় তা অতিক্রম করতে হত। পরে গবেষণা ধনী দেশগুলির একচেটিয়া হয়ে যায় কারণ দামী যন্ত্রপাতি ও অসংখ্য কর্মী নিয়োগ করার ক্ষমতা কেবল তাদেরই আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগের দশ বছরের সায়েন্স একস্ট্রাক্টের (ফিজিক্স) পাতা ওল্টালে দেখা যাবে বহু ভারতীয় উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, বিশেষ করে তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানে। কিন্তু এই অনুপাত পরে কমে যায়। ভারতে প্রকাশিত জার্নালের সংখ্যাও কম হয়ে যায়।

পুরস্কার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রামনের নাম ভারতের প্রতিটি স্কুলের ছাত্রের মুখে উচ্চারিত হতে লাগল। নামটি ছোট এবং উচ্চারণ করাও সহজ। তখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। তিনি রামনের নাগরিক সম্বর্ধনার আয়োজন করলেন। রামন প্রভাব আবিষ্কার যদি রামনের দ্বারা হয়ে থাকে তবে রামনকে আবিষ্কার করার কৃতিত্ব কলকাতা অবশ্যই নিতে পারে। রামনের কাজের গুরুত্ব বুঝতে ইউরোপের তিলমাত্র দেরী হয়নি। 1928 সালে ইতালিয়ান সোসাইটি অফ সায়েন্স তাঁকে মাতুসী পদক দিয়ে সম্মানিত

করলেন। ফ্রেবার্গের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় 1929 সালে তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেন। দেশে তিনি সেবছরই ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন।

ইংরাজরা সেই বছরই তাঁকে স্যার উপাধি দেয়। পরের বছর লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে হিউজেস পদক প্রদান করে। ঘোষণাটি করার সময় নেচার[17] পত্রিকা এই সংস্থায় প্রেসিডেন্ট লর্ড রাদারফোর্ডের কথার উদ্ধৃতি দেয় :

> স্যার ভেঙ্কট রামন আলোক বিজ্ঞানের একজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ, বিশেষ করে আলোক বিক্ষেপণের ক্ষেত্রে। তিন বছর আগে তিনি আবিষ্কার করেন বিক্ষেপণের ফলে আলোর রঙ পরিবর্তিত হতে পারে। তত্ত্বগত ভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী আগে করা হয়েছিল কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও পরিবর্তন খুঁজে পাওয়া যায়নি। গত দশকের এক্সপেরিমেণ্টাল পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান তিন কি চারটি আবিষ্কারের মধ্যে রামন প্রভাবকে ধরা যেতে পারে। ঘন বস্তুর সম্পর্কে গবেষণার ব্যাপারে এটি খুবই শক্তিশালী উপকরণ।

আগের দশকে পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান যথাক্রমে মিলিকান (ইলেকট্রনের ভর ও আধান এবং ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট), সিগবান (এক্স-রে স্পেকট্রোস্কোপি), ফ্র্যাংক ও হার্টজ (ইলেকট্রন ও পরমাণুতে সংঘাত), পেঁরা (ব্রাউনীয় গতি), কম্পটন (কম্পটন প্রভাব), সি. টি. আর. উইলসন (ছোট কণার গতিপথ দেখাবার জন্য ক্লাউড চেম্বার) এবং রিচার্ডসন (ইলেকট্রনের তাপ-আয়নিক নিঃসরণ)। কাজেই প্রধান তিন চারটি আবিষ্কারের একটি এই উক্তির মূল্য অনেক, বিশেষ করে বক্তা যদি হন রাদারফোর্ডের মত বিরাট এক্সপেরিমেণ্টালিস্ট, প্রসঙ্গত রয়্যাল সোসাইটির সর্বোচ্চ সম্মান কোপলে পদকটি সেই বছরই স্যার উইলিয়ম ব্র্যাগকে দেওয়া হয়। রয়্যাল সোসাইটির পদকগুলির মানের ক্রমানুসারে হিউজেস পদক আগে রামফোর্ড, রয়্যাল, ডেভি, ডারউইন, বুক্যানন এবং সিলভেস্টার পদকের পরে।

ফ্যারাডের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব আবিষ্কারের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে নেচার পত্রিকা রামনকে 1931 সালের একটি বিশেষ সংখ্যায় লিখতে অনুরোধ করে। রামনের প্রবন্ধের নাম ছিল "ফ্যারাডের কাছে ভারতের ঋণ"। নামটি কিছু বিচিত্র, কারণ ঋণ কোনখানে তা খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। কেবল রামন লিখেছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দা কালটিভেশান অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করেন ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের আমলে। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা ফ্যারাডে।

1938 সালের নভেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্স রামনের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। এতে লেখেন লিওন ব্রিলোই, কে. ডাবলিউ এফ. কোহলরাউশ, পি. জর্ডন এবং ফ্যাক্স বর্ণ। এই সংখ্যা সম্পর্কে নেচার[18] পত্রিকা মন্তব্য

---

[17] *নেচার,* 126, 898 (1930)।

[18] *নেচার,* 143, 326 (1939)।

করে "ভারতে গবেষণার উন্নতির জন্য যিনি অনেক করেছেন তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে।"

1941 সালে তিনি ফ্র্যাংকলিন পদক লাভ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এইভাবেই প্রথম তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি জানাল। নেচার[19] পত্রিকা যারা রামন সংক্রান্ত সব কিছুর প্রতি দৃষ্টি রাখত, এই ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করে : "রামন যে শুধু তত্ত্বীয় ও পরীক্ষাভিত্তিক পদার্থবিদ্যায় মূল্যবান কাজ করেছেন তাই নয় তাঁর দেশে যে সব বিজ্ঞানীরা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তাঁদের অনুপ্রেরণা দান করেছেন।" এ কথা কি আজ (1978) কোন জীবিত ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী সম্পর্কে বলা যাবে?

রামনের আবিষ্কারের বিশ বর্ষ পূর্তি ফ্রান্সের বোর্দোতে পালিত হল। 1948 সালের 17 এপ্রিল সাক্ষরিত একটি চিঠিতে তিরিশজন কৃতী বিজ্ঞানী লিখে পাঠান, "এখানে যে সব বিজ্ঞানীরা মিলিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই রামনের কাজকে উঁচু চোখে দেখেন। তিনি ভারতে যে গবেষক গোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন ও যাঁদের নিজের বিশ্বাস দিয়ে অনুপ্রেরিত করেছেন তাঁদের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধার সীমা নেই।"

প্রচুর সম্মান আসতে লাগল। 1949 সালে অধ্যাপক জি. এইচ. হার্ডির মৃত্যুর পর তিনি প্যারিস অ্যাকাডেমির বিদেশী সহকারী নির্বাচিত হন। হার্ডি ইংলণ্ডের বিখ্যাত বিশুদ্ধ গণিতজ্ঞ। ইনিই রামানুজনকে খুঁজে বার করে তাঁর প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করেন। ভারতে যখনই সুযোগ হয়েছে দেশবাসী তাদের একমাত্র বিজ্ঞানে নোবেল জয়ী মনীষিকে স্মরণ করেছে। 1935 সালে মহীশূরের মহারাজা তাঁকে 'রাজসভাভূষণ' উপাধি দেন। 1948 সালে যখন প্রথম জাতীয় অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয় তখন নেহরু রামনকে মনোনীত করেন। এই পদের বেতন 2500 টাকা, এবং সঙ্গে কোন সর্ত নেই। রামন রত্ন নিয়ে অনেক লিখেছেন, তিনিই প্রথম ভারত-রত্ন হন, 1954 সালের স্বাধীনতা দিবসে। সেই দিনই বোস সংখ্যায়নের জন্মদাতা সত্যেন্দ্রনাথ বোস পান পদ্মবিভূষণ প্রথম বর্গ; দ্বিতীয় বর্গের পদ্মবিভূষণ পান কে. এস. কৃষ্ণন, এইচ. জে. ভাবা এবং এস. এস. ভাটনাগর। এঁরা সকলেই পদার্থবিজ্ঞানী। সেদিন পদার্থ বিজ্ঞানীদের জয় জয়কার। আর কোন ভারতীয় বিজ্ঞানী কিন্তু ভারত রত্ন পান নি। হরগোবিন্দ খোরানা, যিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় কিন্তু এখন মার্কিন দেশবাসী জেনেটিকস বিশেষজ্ঞ এবং তিনিও নোবেল পুরস্কার পান 1969 সালে—তাঁকে পদ্মবিভূষণ দেওয়া হয়েছিল। মর্যাদায় তা ভারত রত্নের চেয়ে এক ধাপ নীচে।

সোভিয়েত রাশিয়ায় কিন্তু অনেক দিন অবধি রামন প্রভাবকে 'কমবিনেশন বিক্ষেপণ[20] নামে উল্লেখ করা হত, কারো নাম করা হত না। সম্ভবত প্রায় একই সময়ে দুজন রাশিয়ান

---

[19] *নেচার,* 148, 9 (1941)।

[20] *ম্যাকগ্রহিল এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি,* 1971, পৃ: 350।

এই একই প্রভাব বার করেন বলে। তবে ক্রুশ্চেভের আমলে রামনকে (1959) আন্তর্জাতিক লেলিন পুরস্কার দেওয়া হয়। ক্রুশ্চেভ ভারতের খুব বন্ধু ছিলেন।

এই তালিকাই কিন্তু সব নয়। আরও নানাভাবে পুরস্কৃত হন তিনি। তার মধ্যে আছে গ্লাসগোর এল এল ডি, সরবোর্নের (প্যারিস) ডি এস সি, প্যারিসের অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের বিদেশী সহকারী, সোভিয়েত ইউনিয়নের অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের বিদেশী সদস্য, গ্লাসগোর রয়্যাল ফিলজফিক্যাল সোসাইটির সদস্য, রয়্যাল আইরিশ অ্যাকাডেমির সদস্য, হাঙ্গেরীয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের সদস্য, মিউনিখের জার্মান অ্যাকাডেমির সদস্য, জুরিখ ফিজিকাল সোসাইটির সদস্য, চেকোস্লোভাক অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের সদস্য, আমেরিকার অপটিকাল সোসাইটির সাম্মানিক ফেলো, রুমানিয়া সাধারণতন্ত্র অ্যাকাডেমির সাম্মানিক সদস্য ও আমেরিকার ক্যাটগাট অ্যাকুস্টিকাল সোসাইটির সাম্মানিক সদস্য। /রামনের (এবং হেলমহোলজের) বেহালা সংক্রান্ত কাজ এঁরা স্বীকার করেন। পোপ জন তাঁকে পনটিফিকাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের সদস্য মনোনীত করেন। রামন বর্ণালী সংক্রান্ত কাজের মূল্যায়ন করার জন্য এখন মাঝে মাঝেই আর্ন্তজাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, বিশেষ করে লেসারের নতুন প্রয়োগ আবিষ্কারের পর থেকে। 1972 সালে তৃতীয় রামন আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ফ্রান্সের রাইনে।

সম্মান তালিকা অসম্পূর্ণ থাকলে রামন যেন আমাকে মার্জনা করেন। কিন্তু কোন জিনিসই অত্যধিক হয়ে যাওয়া ভাল নয়। এত রকম সম্মান যদি নিউটন পেতেন তাহলে তাঁর মন বিক্ষিপ্ত হত এবং তিনি তাঁর কাজগুলি করে উঠতে পারতেন না। একবার বার্নার্ড শ হিসাব করে বলেন শেক্সপীয়রকে যদি তাঁর মত সম্মানের যন্ত্রণা সহ্য করতে হত তাহলে সম্ভবত তিনি কুড়িটা নাটক কম লিখতেন। (শেক্সপীয়রের নাটকের সংখ্যা আটত্রিশ)। উচ্চ শ্রেণীর মৌলিক কাজ করতে হলে নিরিবিলি পরিবেশ দরকার হয়। পাদপ্রদীপের আলোয় তা হয় না। কিন্তু যাঁরা মহৎ কোন সৃষ্টি করেন তাঁরা নিরিবিলিতে কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তর্কের খাতিরে অবশ্য বলা যায় বিশাল আবিষ্কারের পুনরাবৃত্তি হয় না, সুতরাং প্রশংসা ও খ্যাতি দ্বারা মহান স্রষ্টাদের বিব্রত করা দোষের নয়।

সংযোজন :

ল্যানডাউ ও লিফশিট্‌জ এই আবিষ্কারকে রামন-ল্যাণ্ডসবার্গ-মেণ্ডেলস্টাম এই নামে অভিহিত করেন। (ইলেকট্রোডাইনামিকস অফ কনটিবিউয়াম মিডিয়া, 8ম খণ্ড, পারগামন প্রেস, 1963, পৃ: 387।

রাশিয়ানদের দাবী রামন ও কৃষ্ণানের আগে 1928 সালের জানুয়ারী মাসে তাঁরা বিক্ষপণের বর্ণালিতে বিচ্যুত বিকিরণ পেয়েছিলেন। (জে. এ. কনিঙ্গস্টাইন, ইন্ট্রোডাকসান টু দি থিওরি অফ রামন এফেক্ট, ডি. রিডেল পাবলিশিং কোম্পানী, 1972, পৃ: vii)। অথচ এঁরা

নিজেরাই 6-5-1928 তারিখে প্রেরিত ও 13-7-1928 তারিখে প্রকাশিত পেপারে রামনের অগ্রাধিকার স্বীকার করেছেন —

> এই মুহূর্তে (6মে 1928) আমাদের পক্ষে বিচার করা সম্ভব হচ্ছে না যে আমরা যে পর্যবেক্ষণের কথা লিখেছি তার সঙ্গে রামন প্রথম তাঁর দেখা পর্যবেক্ষণের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়েছিলেন তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা। নাটুরভিস 16, 557 (1928)।

দ্বাদশ অধ্যায়

আণবিক বর্ণালী

আণবিক ও পারমাণবিক স্তরে বস্তুর স্থাপত্য চালিত হয় সামঞ্জস্যের নিয়ম মেনে। যে সব ভৌত নিয়মগুলি বস্তুতে পরিবর্তন ঘটায় সেগুলি সম্পর্কেও এই কথাই বলা চলে। এই সব মৌলিক নিয়ম অনুসরণ না করলে পদার্থের গঠন সম্পর্কে কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা সম্ভব হত না। অবস্থান, পর্যায় ও মাত্রার দিক থেকে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক থাকাই হল সামঞ্জস্যের মূলকথা। কোন সম্পর্কের অস্তিত্ব না থাকলে গবেষণা বা পরীক্ষা হত কি নিয়ে! বিজ্ঞানের মূল ভিত্তিই হল সামঞ্জস্য, সঙ্গতি ও নিয়ম।

বস্তুর কথাই ধরা যাক। বস্তুর ভরের প্রায় সবটাই আছে নিউক্লিয়াসে, চারিদিকের ইলেকট্রনগুলিতে ভরের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে নেহাতই অল্প। তাই অণুর নিউক্লিয়াসই তার গঠন ও সামঞ্জস্যের কাঠামো নির্ণয় করে। বৈদ্যুতিক বলের মধ্যে ভারসাম্যের কারণে অণুর ভিতরের পরমাণুগুলি আটকে থাকে। বাইরে থেকে আলো জাতীয় তড়িৎচ্চুম্বকীয় বিকিরণে এই বল-সাম্য বিঘ্নিত হয় এবং বৈদ্যুতিক আধানসহ অণুগুলি স্পন্দিত হতে থাকে। ফলে তড়িৎচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের বিকিরণ হতে থাকে। এ হল অণুর গঠন ও সামঞ্জস্যের একটি বিশেষ গুণ।

একটি পরমাণুর কার্যকর ব্যাসার্ধ প্রায় 10^{-8} সেমি। নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে 10^{-12} এবং 10^{-13} সেমি। সুতরাং সুসংবদ্ধ একটি বস্তু হিসেবে পরমাণু খুবই খোলামেলা। অথবা সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে খুবই ফাঁকা। অণুর আকার নির্ভর করে তার গঠনের উপর। যেমন ডি এন এ মলিকিউলে অনেকগুলি নিউক্লিওটাইড পেঁচিয়ে আছে (হেলিক্সের আকারে)। প্রত্যেকটি নিউক্লিওটাইড 3.4×10^{-8} সেমি। একটি প্রোটিন রিবোনিউক্লিজ অণুতে থাকে 1876টি নিউক্লিয়াস ও 7396টি ইলেকট্রন। তবে সাধারণ জৈব বা অজৈব অণুর আকার হয় 10^{-7} থেকে 10^{-8} সেমি।

আগেই দেখা গেছে দৃশ্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 3.8×10^{-5} থেকে 7.6×10^{-5} সেমি। এটা যে কোন অণু বা পরমাণুর চেয়ে আয়তনে বড়। কাজেই যে কোন সময়ে আলোর জন্য আস্ত পরমাণুটি মোটামুটিভাবে সমান বিদ্যুত বলক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

উত্তেজিত অবস্থায় অণু থেকে নানাভাবে বিকিরণ হতে পারে। যদি ইলেকট্রনগুলির

শক্তিস্তর পরিবর্তিত হয় তাহলে বিকিরণ হয় উচ্চ কম্পাংকের (এবং বেশি শক্তিসম্পন্ন) দৃশ্য অথবা অতিবেগুনী পর্যায়ের। নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন বা ক্ষয়ের কারণে যে বিকিরণ নির্গত হয় তাতে থাকে আরও উচ্চ কম্পাংকের বেশি পরিমাণে শক্তি। তবে পুরো অণুগুলি প্রভাবিত হলে বিকিরণের সঙ্গে অল্প পরিমাণে স্পন্দন বা আবর্তন জনিত শক্তি নির্গত হয়। শক্তি স্থানান্তর করণের প্রক্রিয়াটি নিউক্লীয়, ইলেকট্রনিক বা আণবিক (স্পন্দনজনিত বা শেষের ক্ষেত্রে আবর্তনজনিত) যাই হোক না কেন স্থানান্তর হবে ঝলকে ঝলকে। তা এই নিয়ম অনুসরণ করবে : v যদি হয় বিকিরণের কম্পাংক (নির্গত অথবা শোষিত) এবং h যদি হয় প্ল্যাংক ধ্রুবক 6.626×10^{-27} আর্গ-সেকেণ্ড তাহলে শক্তির ঝলক হবে hv। অণুর ক্ষেত্রে এই কম্পাংক তাদের গঠন ও সঙ্গতির বৈশিষ্ট্যসূচক। প্রত্যেক অণুর অনেকগুলি বিশেষ কম্পাংক থাকবে, তবে কম্পাংকগুলি ছোট, ফলে বিকিরণ থাকবে অবলোহিত অঞ্চলে। অর্থাৎ এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 7600 Å বা দৃশ্য বিকিরণ সীমার চেয়ে বড় হবে। ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে যেখানে বেশি শক্তির স্থানান্তর হচ্ছে সেখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট।

অণুগুলি ঠিক কিভাবে উত্তেজিত হয়ে রামন বিকিরণ তৈরী করে? আগেই সংক্ষেপে বলা হয়েছে নেগেটিভ বৈদ্যুতিক আধান (ইলেকট্রন) ও পজিটিভ বৈদ্যুতিক আধানের (প্রোটন) সমাপতন সচরাচর হয় না। ফলে, তারা চুম্বকের মত দ্বি-মেরু পদ্ধতি তৈরী করে। দুই আধানের পরিমাণ ও দূরত্বের গুণফল থেকে দ্বিমেরু ভ্রামক পাওয়া যাবে। আলোকের মত তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের তড়িৎ ক্ষেত্রে কোনো অণু এসে পড়লে সেটি বিকৃত হয়, কারণ পজিটিভ নিউক্লিয়াস ও নেগেটিভ ইলেকট্রন বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হয়। এতে অণুর দ্বিমেরু ভ্রামকে পরিবর্তন আসে। বিদ্যুত ক্ষেত্রের বিচলনের ফলে অণুর দ্বিমেরু ভ্রামকের পরিবর্তন দ্রুততর হয়। এই পরিবর্তনই রামন বিকিরণের তৎক্ষণিক কারণ, মনে রাখতে হবে রামন বিকিরণ হয় অবিষ্ট দ্বিমেরু ভ্রামকের পরিবর্তনের ফলে, কেবলমাত্র দ্বিমেরু ভ্রামকের পরিবর্তনে নয়। রামন উদ্দীপনার স্থায়িত্ব মাত্র 10^{-12} সেকেণ্ড। যে কোন সময়ে প্রতি 10^{-6} অণুর মধ্যে একটিতে এর প্রভাব দেখা যায়। /

আবিষ্ট শোষণ বা নিঃসরণ বিক্ষেপকের গঠন ও উপাদানের বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। বিকৃত অণু থেকে শোষিত বা বিকিরিত শক্তি (hv′) আপতিত ফোটনের (hv) শক্তিতে পরিবর্তন ঘটায় ফলে বিক্ষিপ্ত বিকিরণে h(v+v′) শক্তি সম্পন্ন ফোটন থাকে। স্থিতিস্থাপন র‍্যালে প্রক্রিয়ার ফলে বিক্ষিপ্ত ফোটনে, দিকপরিবর্তন হলেও শক্তি (hv) পরিবর্তিত হয় না। রামনের অণু বর্ণালীতে তাই বিক্ষেপকের প্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাওয়া যায়:

1. **প্রতিসাম্যের মূল কথা যেমন প্রতিসাম্যের কেন্দ্র, তল, অক্ষ ইত্যাদি।**

যেমন N_2O অণুর NON বা NNO এই যে কোন দুটি রৈখিক আকার থাকতে পারে। প্রথমটি প্রতিসম, দ্বিতীয়টি নয়। রামন বর্ণালী দেখাল যে রীতিটি অসম, যেমন NNO। তবে আবার মিথেন

(CH_4) এবং কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) দুটিরই গঠন প্রতিসম।

2. আণবিক গঠন

অণুর গঠনের একটি যুক্তিসঙ্গত মডেল অনুমান করে নিয়ে রামন বর্ণালী তত্ত্বগতভাবে কষে দেখা যায়। যে রেখাগুলি দেখা যাচ্ছে সেগুলি যদি অনুমান করা রেখার সঙ্গে মিলে যায় তাহলে মডেলটি ঠিক প্রমাণিত হবে। তবে এই পদ্ধতিটি চূড়ান্ত নয়। এর থেকে আরও সম্ভাব্য মডেলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

3. তাপগতীয় রাশি

রামন রেখার কম্পাংক ও অন্যান্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাপধারণ ক্ষমতা, এনট্রোফি ও গঠনের অবাধ শক্তি প্রভৃতি তাপগতীয় রাশি হিসাব করে বার করা যায়।

4. ক্রিয়াশীল গোষ্ঠী (ফাংশনাল গ্রুপ)

অণুর ভিতরের সক্রিয় পরমাণু গোষ্ঠী ও রামন বিকিরণের মধ্যে প্রতিষহ বা সহগমন থাকে। যেমন নিচের পরমাণু গোষ্ঠীর ট্রান্স অলিফিনিক হাইড্রোকার্বনের দ্বিমুখী বন্ধনে স্পষ্ট রামন রেখা দেখা যায় যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 58140 Å (তরঙ্গ সংখ্যা 1720 সেমি$^{-1}$)
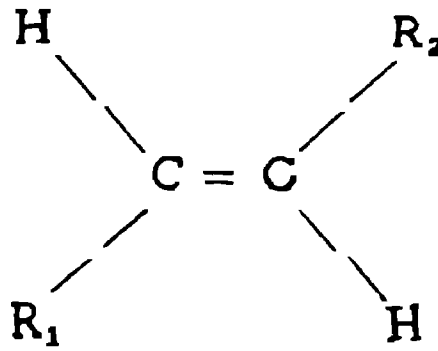
5. মিশ্রণের বিশ্লেষণ

যে সব মিশ্রণে পারস্পরিক রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না সেগুলির রামন বর্ণালী একটি অন্যটির উপর পড়ে। রামন রেখার তীব্রতা নির্ভর করে উপাদানের গাঢ়তার উপর। সুতরাং এইভাবে ধর্ম ও পরিমাণগত দিক দিয়ে উপাদানের মূল্যায়ন করা সম্ভব। যেসব অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন মিশ্রণে দুই থেকে তিনটি উপাদান আছে তাতে বিভিন্ন উপাদানগুলি সনাক্ত করার ব্যাপারে ভুলের সম্ভাবনা।

আলাদা করে রামন বর্ণালীবিজ্ঞান থেকে এবং অবলোহিত ও এক্স-রে বর্ণালী বিজ্ঞানের সঙ্গে যৌথভাবে অণুর আভ্যন্তরীন বলের এবং জাড্যের ভ্রামক সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। আইসোটোপ বদলে দিলে যেমন হাইড্রোজেনকে ডায়টেরিয়ম দিয়ে) তথ্য আরও বাড়ে। তীব্র, একবর্ণী ও সমান্তর লেসার রশ্মিকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করে, জৈব, অজৈব, গ্যাসীয় ও কেলাসিত প্রণালীরও বিশ্লেষণ সম্ভব হল। শিল্পসংক্রান্ত রসায়নে তাই রামন বিশ্লেষণ খুবই জোরালো হাতিয়ার। কঠিন বস্তুর রহস্য অনুসন্ধানে এটি প্রায় এক্স-রশ্মির মতই শক্তিশালী অস্ত্র। 1941 সালে রামনকে ফ্রাংকলিন পদক দেবার সময় ডঃ টি. ডি. কোর্প[1] যেমন বলেছিলেন, "কেলাসে আলোক বিক্ষেপণ নিয়ে গবেষণা খুবই উচ্চাঙ্গের মৌলিক জ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত করল।"

---

[1] *জার্নাল ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউট*, 232, 211 (1941)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র

অবসর সময়ে বৈজ্ঞানিকরা জল্পনা করেন নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞানের আওতায় আনা যায় কিনা। সম্ভবত প্রাচীনতম নান্দনিক অনুভব হল সঙ্গীত। পদার্থবিজ্ঞান ও শরীর বিজ্ঞানের ভাষায় কি সঙ্গীতকে প্রকাশ করা সম্ভব? ঐক্যতানকে কি সংখ্যার পর্যায়ে আনা যায়? স্বরসমষ্টির নির্বাচনের সঙ্গে কি মানুষের গভীর প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা যায়? ফরাসী অঙ্কবিদ দালেমহার্ট ও জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ ও পদার্থবিদ হেলম্‌হোলৎজ প্রাকৃতিক সুরসমন্বয় বিষয়ে একটি তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। স্যার জেমস জিনস তাঁর 'সায়েন্স অ্যাণ্ড মিউজিক'[1] বইটিতে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে কোন সাধারণ তত্ত্ব গড়ে ওঠার এখনো বেশ দেরী আছে মনে হয়।

বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢাক জাতীয় যন্ত্রগুলিই প্রাচীনতম। এর গঠন প্রণালী থেকেই বোঝা যাবে এর অতীত সেই যুগে চলে গেছে যখন মানুষ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। পশুচর্ম, চামড়ার ফালি, ফাঁকা কাঠের বাক্স সম্ভবত গাছের গুঁড়ি থেকে—এই হল ঢাকের উপাদান। ঢাকের শব্দের যে উত্তেজক গুণ আছে সে বিষয়ে ওথেলো নাটকে উল্লেখ আছে। আদিম মানবও সম্ভবত এর প্রভাবমুক্ত ছিল না। যুদ্ধে যেতে প্ররোচিত করত দ্রুত তালের বাদ্য এবং শোক প্রকাশের চিহ্ন ছিল হিমালয়ে গম্ভীর ঢাকবাদ্য। বিঠোভেনের রচনাগুলিতে ড্রামের বিশেষ ভূমিকা আছে।[2]

সব সমাজেই কোন না কোন ধরনের ঢাকজাতীয় বাদ্যের প্রচলন আছে। নামগুলির মধ্যে শব্দের অনুসরণ করার প্রবণতা আছে (ফরাসীতে তামবুর, জার্মানে ট্রোম, ইতালীয়ানে তামবুরো, তামিলে মৃদঙ্গ) তা থেকে এর প্রাচীনত্ব প্রকাশ পায়।

ঢাকের নির্মাণ ও গঠন ভারতবর্ষে খুবই উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল। রামনের কাজ থেকে তার প্রমাণ মেলে। এর ধ্বনি বৈচিত্রের তীক্ষ্ণতা ও চমৎকারিত্বের একমাত্র তুলনা বহু শতাব্দী ধরে পরিশীলিত এর বাদন কৌশল। নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীর মধ্যে এর জটিল তালের খেলা বৃত্তাকার ছন্দের চিরাচরিত ধারনাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে গেছে। ভারতীয় তবলায় শুধু

---

[1] *জেমস জিনস, সায়েন্স এণ্ড মিউজিক,* কেম্ব্রিজ, 1937, পৃ: 157।

[2] পি. এম. ইয়ং, *ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক,* মেথুন, লণ্ডন, 1955, পৃ: 42।

যে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে বিচিত্র ও বিভিন্ন তালের খেলা চলে তাই নয়, বাঁয়া ও তবলা দুটিতে দুরকম নক্সা বাজান হয়। তা আবার একটি বৃহত্তর তাল ও লয়ের পুনরাবৃত্তির মধ্যে মিলে যায়। এ যেন পশ্চিমের ধ্রুপদী সঙ্গীতের কাউন্টার পয়েন্টের মত। এছাড়া কিছু কিছু তাল কৌশল করে গোপন রেখে সৃজনশীলতার অনেক সুযোগ থাকে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশকে একক ধরে যে তালপদ্ধতি গড়ে উঠেছে তার ভাষা ও বর্ণ সম্পূর্ণ আলাদা। তবলা বাজাতে দুটি হাতের একই সঙ্গে বিভিন্ন ভঙ্গী আয়ত্ত করতে হয়। কাজটি করতে উচ্চশ্রেণীর সমন্বয় ক্ষমতা লাগে। তাই ভাল তবলা বাজান খুব কঠিন।

ভারতীয় ঐক্যতানে তবলা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের স্থান সবচেয়ে উপরে কারণ অন্য সব বাদককে এর লয় ও ছন্দের নিয়ম মেনে চলতে হয়। ফাইনম্যানের বিখ্যাত বই লেকচার্স ইন ফিজিক্সের প্রথম পাতায় একটি ছবি আছে —লেখক দু হাতে ড্রাম বাজাচ্ছেন। কিন্তু দুটি হাত দিয়ে একসঙ্গে দুটি যন্ত্র বাজালে কেমন হয়? তাতে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা বাড়ে। ভারতীয়রা এই কাজে সফল হয়েছে। মৃদঙ্গে একটি যন্ত্রেরই দুটি মুখ আছে—দু-মুখী ড্রামের মত। বাঁয়া তবলাতে দুটি মুখ দুভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। নারী ও পুরুষ যুগলের মত এর একটিকে স্ত্রী ও অন্যটিকে পুরুষ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। (রামন তবলা বানানটি ঠিক লেখেননি, তবে ভগবন্তম এটির ঠিক বানান অনুসরণ করেছেন)।

শব্দ কিভাবে আমাদের অনুভূতিকে প্রভাবিত করে, পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা নিয়ে গত শতাব্দীতে গবেষণা করেন জার্মানীর হেলম্‌হোলৎজ[3] তাঁর একটি সিদ্ধান্ত হল ধ্বনির গুণ ও প্রভাব নির্ভর করে মৌলিক স্বরের হার্মনিকস ও ওভারটোনের উপর। (অর্থাৎ যে সব অংশে মৌলিক স্বরের 2, 3, 4 গুণ কম্পাংক থাকে)। এই ধারণা অনুসরণ করে রামন ভারতীয় আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এদের শাব্দিক গুণ যে কত নিখুঁত তা প্রমাণ করা এবং যাদের চেষ্টায় এগুলি সৃষ্ট হয়েছে তাদের রুচি ও আবিষ্কারের শক্তি যে কত উন্নত ছিল তা দেখানো। শব্দবিজ্ঞান নিয়ে রামন যত প্রবন্ধ লিখেছেন[4] তার মধ্যে গোড়ার দিকে ছিল আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গবেষণা পত্রগুলি।[5]

বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ করে বেহালার মত তারের যন্ত্রে তাঁর আগ্রহ ছিল সুবিদিত। এই বিষয়ে তিনি নেচার ও ফিলজফিকাল ম্যাগাজিন পত্রিকায় গবেষণা পত্রও প্রকাশ করেছেন। এইসব কারণে 1927 সালে হ্যাণ্ডবুক ডার ফিজিক নামক বিখ্যাত জার্মান পত্রিকা তাঁকে বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করে। এটা খুবই সম্মানের। রামন তখনও নোবেল পুরষ্কার পান নি। বেহালার ছড়ের কমনীয় সঞ্চালন এবং তারের অগ্রভাগের ফটো তুললেন

---

[3] ভন হেলম্‌হোলৎজ, *সেনসেশন অফ টোন,* 1862।

[4] সি. ভি. রামন, *ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্স,* 1, 179 (1934)।

[5] সি. ভি. রামন ও এস. কুমার, *নেচার,* 500, 104 (1920)।

রামন[6]। তিনি পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন যে ছড়ের এবং তারের সঙ্গে বিদুর স্পর্শ কেন্দ্রগুলির গতি এক। হেলমহোলৎজ এই অনুমানই করেছিলেন। 1914 সালে জার্মানীতে কালাহানে রামনের তার স্পন্দনের উপর গবেষণাটির মূল্যায়ন করেন।

পরে 1934 সালে রামন ভারতীয় আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বিশদ নিবন্ধ লেখেন। অতি উৎসাহের বশবর্তী হয়ে তিনি এই বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ পুস্তক লেখার অঙ্গীকার করেন, কিন্তু 1934 সালের নিবন্ধটিই সম্ভবত বাদ্যযন্ত্রের বিষয়ে তাঁর শেষ লেখা এবং এই প্রবন্ধটিও যে সব কাজের উপর ভিত্তি করে লেখা তা 1919 সালের আগে করা।

তবলা ও অন্য ভারতীয় আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে ধীরে ধীরে পূর্ণতা পায়। কিন্তু রামনের গবেষণা থেকে মনে হবে যেন এর প্রস্তুতকারকেরা ঠিক কি হবে তা আগে থেকেই জানতেন। বাঁয়া ও তবলার গঠন এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে ঝিল্লীর টান সমান রাখার জন্য তার সঙ্গে ষোলোটি চামড়ার ঘাট যুক্ত থাকে। কাজেই তবলা বাদক যখন যন্ত্রে সুর বাঁধেন তখন তার সবটাই অনর্থক নয়। বাঁয়ার উপরে লোহার অক্সাইড, কাঠকয়লা, স্টার্চ ও আঠা দিয়ে একটি গোলাকৃতি চাকতি বসান থাকে। একটি যন্ত্র দিয়ে চেপে চেপে এই উপকরণগুলি সাঁটা হয়। বৃত্তের মাঝখানটা সবচেয়ে পুরু ও পাশের দিকে ক্রমশঃ পাতলা। এই গোলটি লাগাবার সময় ধ্বনি ঠিক আসছে কিনা বার বার পরখ করে দেখে নেওয়া হয়। তবলার উপরে মাখা ময়দা দিয়ে ভার দেওয়া হতে থাকে। এটি অসমভাবে লাগান হয়।

ধ্বনির রেশ যাতে তাড়াতাড়ি মিলিয়ে না যায় তার জন্য এই বাড়তি বস্তুটি ব্যবহৃত হয়। এতে বাড়তি গতিশক্তি ধরে রাখার ক্ষমতা আছে। অবরুদ্ধ বাতাস এই ধ্বনির রেশ ধরে রাখার কাজে সাহায্য করে। বাঁয়া বাজান হয় বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে। তবলা বাজাতে হয় ডান হাতের তালু ও আঙ্গুল দিয়ে। রামন দেখান একজন দক্ষ বাদক ঝিল্লীর স্পন্দনে অনেক বৈচিত্র আনতে পারেন। পাঁচটি টোনের হার্মনিক পর্যায় এতে আনা সম্ভব। ঝিল্লী স্পন্দিত হবার পরক্ষণেই তার উপর বালি ছড়িয়ে রামন বিভিন্ন হার্মনিকসের অর্থাৎ পূর্ণগুণিত উপসুরের উপরিপাতের চিত্র লক্ষ্য করতে পারেন।

খুবই সহজ পদ্ধতিতে রামন এই গবেষণা চালান এবং সকলের পক্ষেই এর ফলাফল দেখা সম্ভব ছিল। সাধারণ এবং সহজে পুনরাবৃত্তি করার যোগ্য এই দুটি গুণ রামনের সব কাজের মধ্যেই বর্তমান।

---

[6] সি. ভি. রামন, *ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশান অফ সায়েন্স বিল* নং 11, 43 (1914)।

চতুর্দশ অধ্যায়

ফোটনের স্পিন

নতুন কাজ বা ধারনাকে সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করা পশ্চিম সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শেলী ও কীটস যা কবিতা লেখেন তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে লেখা হয়েছে সেই কাব্য সম্পর্কে। শেক্সপিয়রের উপর মন্তব্য তো একটি লাইব্রেরী ভরে যাবে। বিদগ্ধ সমালোচনার অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হলেই মহৎ সৃষ্টির মূল্য বাড়ে ও বিদ্যাচর্চার মান বৃদ্ধি হয়। এই ঐতিহ্য কিন্তু ভারতের কলা ও বিজ্ঞানে এখনও তেমন শেকড় গাড়েনি।

রামন ও তাঁর মেধাবী ছাত্র ভাগবন্তম ফোটনের স্পিন (চক্রণ) নিয়ে কিছু গবেষণা আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁর গবেষক দলের অন্য কেউই এই গবেষণার তত্ত্বগত দিকের সত্যতা যাচাই করে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেন নি এমন কি পরীক্ষাগুলিও আবার করে দেখেন নি ফলাফল ঠিক না ভুল। এই গবেষণার থিওরি সম্পর্কে যদিও সন্দেহ আছে, কিন্তু এই শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ এক্সপেরিমেণ্টাল বিজ্ঞানী তাঁর পর্যবেক্ষণে ভুল করবেন এমন মনে হয় না।

আলোক কণা বা ফোটনের একটি বিশেষ ধর্ম স্পিনকে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল এই কাজের উদ্দেশ্য। ফোটনের যেহেতু কম্পাংক এবং তরঙ্গ চরিত্র আছে, তাই একে v কম্পাংকের এক আলোক তরঙ্গ গোষ্ঠী বলে ধরে নেওয়া যায়। ফোটনের ধর্ম বড় বিচিত্র। এর গতিবেগ দর্শকের চোখে সব সময়ই এক, দর্শক যেভাবেই ভ্রাম্যমান হোক না কেন। সুতরাং এ কখনই স্থির অবস্থায় থাকে না। গতিবেগের কারণে এর ভরবেগ আছে। ভরবেগ $h\nu/c$ কম্পাংকের উপর নির্ভরশীল, h হল প্ল্যাংক ধ্রুবক। ভরহীন হলেও ফোটনের $h\nu$ শক্তি আছে। এটাও কম্পাংকের উপর নির্ভরশীল। এ ছাড়াও এর $h/2\pi$ পরিমাণ নির্দিষ্ট স্পিন আছে। এটি কিন্তু কম্পাংকের উপর নির্ভরশীল নয় এবং চলন শক্তি ($h\nu$) যাই হোক না কেন সব ফোটনের পক্ষে এটি সত্য। স্পিন দু দিকের যে কোন দিকেই হতে পারে। বীজগণিতের ভাষায় বলতে গেলে এটা $+h/2\pi$ অথবা $-h/2\pi$ হতে পারে। ফোটনের স্পিন $+h/2\pi$ থেকে $-h/2\pi$ বা উল্টোভাবে লাফ দিতে পারে কিন্তু অন্য কোন নিয়ম অনুসরণ করে না। ফোটন ও বস্তুকণার পারস্পরিক ক্রিয়াতে সম্পূর্ণ স্পিন কিন্তু নিত্য থাকে। শক্তির নিত্যতা সরল ভরবেগ ও কৌণিক ভরবেগের মত ঘূর্ণনের নিত্যতারও নিয়ম আছে। রামন ও ভগবন্তম এই পরীক্ষাটি শুরু করার আগে তাঁদেরই ভাষায় 'ফোটন-স্পিন'

ছিল বিমূর্ত গণিতিক ভাবনা, তার কোন পরীক্ষালব্ধ ভিত্তি ছিল না।

ফোটনের ভিতরে যে কি হয় তা কেউ জানে না। ঘূর্ণমান কোন বস্তুর কৌণিক ভরবেগের সঙ্গে ফোটনের স্পিনের কিছুটা মিল আছে। কিছুটা কারণ ফোটন ও মৌলকণার স্পিনে ঘূর্ণমান মোলের মত কোন মাঝামাঝি ব্যাপার নেই—স্পিন হয় উপরে অথবা নীচে। মোলের অসংখ্য অক্ষ আছে। ডিরাকের[1] মত অনুযায়ী মৌল কণার এই স্পিন ভিতরের কোন গতির কারণে ঘটে থাকে।

সত্যেন্দ্রনাথ বোসের 1924 সালের পেপারে আলোক ফোটনের স্পিনের পূর্বাভাস ছিল। এতে তিনি প্ল্যাংক সূত্রের গুণাংকের ঠিক মনে পাবার জন্য 2-এর গুণিতক ব্যবহার করেছিলেন। আলোর কোয়ান্টার দুটি ধ্রুবন অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য এই গুণিতক ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। আলোর ধ্রুবন অবস্থা তাই স্পিনের দিক বরাবর হয়।

1931 সালে রামন ও ভগবন্তম যে প্রশ্ন নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তা হল ফোটনের যে স্পিনের কথা দাবী করা হয়েছে তা কি পরীক্ষা করে মাপা সম্ভব?

আগেই বলা হয়েছে এই স্পিন শুধু যে তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তির বাহক ফোটনে থাকে তা নয় প্রায় সব মৌল কণাতেই থাকে। পর্যবেক্ষণ ও থিওরী থেকে জানা গেছে বিভিন্ন কণার স্পিন হয় শূন্য, অথবা কোন ছোট অখণ্ড সংখ্যা অথবা $h/2\pi$ এককের অখণ্ড গুণিতকের অর্ধেক। এর নির্দিষ্ট মান 0, +½, –½, +1, –1 ইত্যাদি। এখন দাবী করা হয় প্রতি গ্রাভিটনে 2 হল মৌল কণায় স্পিনের সর্বোচ্চ মাত্রা। মহাকর্ষীয় শক্তির কোয়াণ্টা হল গ্রাভিটন। যাদের স্পিন ±1 এককের সমান ফোটন সেই শ্রেণীভুক্ত। ইলেকট্রন, প্রোটন বা নিউট্রনের ক্ষেত্রে স্পিন ±½ একক। ফোটনের স্পিন কেন ইলেকট্রন, প্রোটন বা নিউট্রনের চেয়ে বেশি তা এখনো স্পষ্ট নয়।

রামন এবং ভগবন্তম বললেন অণু ও পরমাণুর সঙ্গে ফোটনের পারস্পরিক ক্রিয়া হলে শুধু রামন প্রভাব ছাড়াও তাদের মধ্যে স্পিনের অদলবদল হওয়া উচিত। আগে আবিষ্কৃত রামন প্রভাবে স্পন্দিত বস্তুকণার সঙ্গে ফোটনের স্পন্দন শক্তির বিনিময় হয়। আগেই বলা হয়েছে—কয়েক রকম বিনিময়ের বেশি হতে পারে না। ফোটন কেবলমাত্র +1 থেকে –1 এককে যেতে পারে, অথবা –1 থেকে +1 এককে। বস্তুকণার ক্ষেত্রেও নির্বাচনের কতকগুলি নিয়মই কার্যকর হয়।

স্পিনের অবস্থা আলোর ধ্রুবনে প্রতিফলিত হয়। কাজেই রামন ও ভগবন্তম পরীক্ষা করে বস্তুর দ্বারা বিচ্ছুরণের ফলে ফোটনের স্পিনে কি পরিবর্তন হয় তা নির্ণয় করতে সক্ষম হন। পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্য তাঁদের তত্ত্বের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেল।

রামন বিচ্ছুরণের সময়েও আলোক কিছুটা বিধ্রুবিত হয়। রামন ও ভগবন্তমের ধারণা

---

[1] পি. এ. এম. ডিরাক, *দ্য প্রিন্সিপল্‌স অফ কোয়ান্টাম মেকানিক্স*, অক্সফোর্ড, 1947।

অনুযায়ী স্পিন বিনিময়ের ফলে আরও কিছু পরিবর্তন আসে। উদাহরণ হল কার্বন ডাই অক্সাইডে পরীক্ষা করে দেখা গেছে স্পিন বিনিময়ের ফলে আলোর বিধ্রুবণ 4% কমে। অংকের হিসেব ছিল 3.4%। রামন বিক্ষেপণের ফলে যে আলোর বিধ্রুবণ হয় তাছাড়াও থাকে স্পিন বিনিময় প্রভাব।

আলোক কণার স্পিনের পরীক্ষামূলক যাচাই থেকে এই দুই ভারতীয় অনেক কিছু আশা করেছিলাম। রামন তাঁর চরিত্র অনুযায়ী রেডিওগ্রাম যোগে বিখ্যাত নেচার পত্রিকায় উত্তেজিত বার্তা পাঠান 1931 সালের 28 সেপ্টেম্বর। খুব অল্পদিনের মধ্যে, 3 অক্টোবর নেচারে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। এরপরে 12 অক্টোবর রেডিও যোগে আর একটি বার্তা পাঠান হয়। 24 অক্টোবর পাঠান লিখিত প্রবন্ধ ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্সে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা রামনই কলকাতা থেকে প্রকাশ করতেন। 1932 সালের গোড়ার দিকে নেচারে আর একটি চিঠি প্রকাশিত হয়—এটিও ছিল ফোটন স্পিনের বিষয়ে। কিন্তু এই আবিষ্কারের কোন কদর হল না। এমনকি ভগবন্তমের নিজের লেখা আলোক বিক্ষেপণ সংক্রান্ত বইয়েও এর উল্লেখ ছিল না। বইটি প্রকাশিত হয় 1940 সালে। এর ভূমিকা লেখেন রামন স্বয়ং।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় বলা যায়। বৃত্তধ্রুবিত আলো স্বচ্ছ 180° রিটার্ডারের (মন্দন সৃষ্টি কারক) মধ্যে দিয়ে গেলে ধ্রুবণ ও স্পিনের দিক পরিবর্তন হয় এবং ঝুলন্ত রিটার্ডার কৌণিক ভরবেগ লাভ করে, তার ফলে যে টর্ক উৎপন্ন হয় তা মাপেন আমেরিকার আর. এ. বেথে[2]। ঝোলান রিটার্ডারের যে স্বাভাবিক কম্পাংক তার সমান হারে আপতিত আলোয় দক্ষিণাবর্তী ও বামাবর্তী বৃত্ত-ধ্রুবণ অবস্থার পরিবর্তন করে বেথে অনুনাদ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এই কাজ হয় রামন ও ভগবন্তমের পরীক্ষার চার বছর পরে।

---

[2] আর. এ. বেথে, *ফিজিক্স রিভ্যু*, 50,115 (1936)।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা ভারতীয় দার্শনিকেরা স্মরণাতীত কাল থেকে বলে আসছেন। ধর্ম ও ভাষার কারণে অনেক সময় ঐক্য চাপা পড়ে বৈচিত্র্যই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু এই যে চোদ্দটি প্রধান ভাষা ও প্রায় আধ ডজন ধর্ম নিয়ে ভারতে সকলে মিলেমিশে আছে এটাই এক পরমাশ্চর্য। নেপোলিয়নের ইচ্ছা সত্ত্বেও ইউরোপ রাজনৈতিক ভাবে এক হতে পারল না—যদিও তাদের জনসংখ্যা ভারতের অর্ধেক এবং ভাষাও এত বেশি নয়। ই ই সি কেবল সুবিধাজনক গোষ্ঠী মাত্র—তার বেশি কিছু নয়।

1930 সালের ভারতবর্ষে কিন্তু প্রাদেশিকতা বোধ মাথা চাড়া দিয়েছিল। বঙ্গদেশ রামনকে আবিষ্কার করে, কিন্তু ক্রমে দেখা গেল বাঙালী গবেষকদের সুযোগ দেবার ব্যাপারে রামন বড় পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন। সেই সময় তাঁর বেশির ভাগ সহকারীই ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয়। কলকাতার একটি সংবাদপত্রে রামনের নিন্দা করে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়, তাতে তাঁর প্রশাসন ক্ষমতারও যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়। এতে বলা হয় :

> "বিজ্ঞানী মাত্রেই দক্ষ প্রশাসক হন না এবং প্রাত্যহিক জীবনে যে সব গুণগুলিকে মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে বিজ্ঞানী হিসেবে প্রসিদ্ধির অর্থ এই নয় যে সেই গুণগুলির প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

এর উত্তরে রামন বলেন তিনি কেবল বাংলার গবেষক গোষ্ঠী না গড়ে সর্বভারতীয় গবেষক গোষ্ঠী গড়তে উৎসাহী। তিনি গর্ব করে আরও বলেন তিনি যদি তাই করতেন তাহলে নোবেল প্রাইজকে সুয়েজের পূর্বদিকে আসতে হত না। রামনের ভাষায় তাঁর কর্মজীবনের স্বর্ণযুগ অবশেষে শেষ হতে চলল। তাঁর কলকাতা পর্ব শেষ হল।

1933 সালের গোড়ার দিকে রামন বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিরেক্টর পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ পেলেন। সুরম্য উদ্যান ও অনুকূল আবহাওয়ার জন্য বিখ্যাত এই শহরে 1906 সালেই দূরদর্শী পার্সী জামশেদজী টাটা এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। 1933 সাল অবধি ইংরাজরাই এর কর্ণধার ছিলেন। শেষ ইংরাজ অধিকর্তা ছিলেন ডঃ এম. ও. ফর্স্টর। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিলে তাঁর বিজ্ঞানচর্চার পথে বাধা হবে কিনা এ বিষয়ে রামন খুব নিশ্চিত ছিলেন না, তাই তিনি এক বছরের জন্য এই প্রশাসনীয় পদটিতে গিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এক বছরের ছুটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করলেন না। বাংলাদেশে ফেরার পথ এইভাবে বন্ধ হয়ে গেল। অগত্যা বাঙ্গালোরে যাওয়া

ছাড়া রামনের উপায় ছিল না।

রামন যোগ দেবার আগে বাঙ্গালোরের ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে কোন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ ছিল না। রামনের চেষ্টায় ভাল ফিজিক্স ল্যাবরেটরী গড়ে উঠল ও ভাল কাজ হতে লাগল। 1935-37 সালে তাঁর সাহায্যে তাঁরই ছাত্র নগেন্দ্রনাথ অতিশব্দিক স্পন্দনের ফলে তরলে আলোর বিচ্ছুরণ সম্পর্কে একটি নতুন প্রস্তাব দেন। ফরাসী বিজ্ঞানী এল. ব্রিলোঁই[1] এ বিষয়ে 1921 সালে একটি থিওরি উপস্থিত করেন এবং 1933 সালে তারই একটি সংশোধিত রূপ দেন। নগেন্দ্রনাথ রামনকে জানালেন যে ব্রিলোঁই-য়ের থিওরি কিন্তু তাঁর পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে মিলছে না। রামন 'এক লাফে অঙ্কের বাধা পেরিয়ে' (কথাটি ম্যাক্স বর্নের ব্যবহার করা) পুরো ঘটনাটির একটি ভৌত চিত্র মানসচক্ষে দেখতে পেলেন।[2] তিনি দেখলেন শব্দ পর্যায়ক্রমে সঙ্কোচন ও প্রসারণের অবস্থা তৈরী করে। তার ফলে মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কে অনুরূপ পরিবর্তন হবে এবং মাধ্যম থেকে নির্গত আলোর সম্মুখভাগ হবে ঢেউ তোলা।

নগেন্দ্রনাথ তখন এই থিওরির অঙ্কের বুনিয়াদ তৈরী করলেন। থিওরি হল এই যে মাধ্যম থেকে আলো নির্গত হচ্ছে তা এক ধরনের বিশুদ্ধ "দশা-গ্রেটিং" এর মত কাজ করে[3] রামন ও নাথের এই থিওরি[4] শুধু যে বিচ্ছুরণের পরে আলোর তীব্রতার সংস্থানের ব্যাখ্যা দিল তাই নয় কম্পাংকের ডপলার সরণেরও উপর আলোকপাত করল। 'দশা-গ্রেটিং' ধারনাটি পরে কেন্দ্রীয় বলের দ্বারা উচ্চশক্তি কণার বিক্ষেপণ তত্ত্বে কাজে লাগান হয়।

রামনের বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম ভালই চলছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ শুরু হয়েছিল। 1937 সালের পয়লা জুন গভর্নিং কাউন্সিলের মিটিঙে রামনকে ডিরেক্টর পদ ছেড়ে দিয়ে শুধু পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করে যেতে বলা হয়। এই পদে কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না। রামন ছিলেন কাউন্সিলের সেক্রেটারি। তিনি এই প্রস্তাবে প্রথমে রাজি হন না কিন্তু জুলাই 20 তারিখের মিটিঙে সম্মত হন। অধ্যাপক হিসেবে তাঁর বেতন মাসিক 2500 টাকা ধার্য হয়। তখনকার দিনে এই টাকা অনেক। (ভারত সরকারের সচিবরা তখন পেতেন মাসে 4000 টাকা)। কাউন্সিল রামনকে অপসারণের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে তারা সাময়িকভাবে রাও বাহাদুর ভেঙ্কটাচারকে মাসিক 1000 টাকা বেতনে ডিরেক্টর নিযুক্ত করে। তখন মধ্য প্রদেশের ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ছিলেন মি: সি. ই. ডাবলিউ জোনস, সি. আই. ই.। তাঁকে 1250 টাকা বেতনে রেজিস্ট্রার

---

[1] এল. ব্রিলোঁই : *অন্যাল ফিজিক্স*, 17. 103 (1921); *অ্যাকচুয়াল সায়েন্টিস্ট ইণ্ডিয়া*, 59 (1933)।

[2] এন. এস. নগেন্দ্রনাথ *কারেন্ট সায়েন্স*, 40, 235 (1970)।

[3] এম. ভি. বেরী : *দি ডিফ্রাক্সান অফ লাইট বাই আল্ট্রাসাউণ্ড*, অ্যাকাডেমিক প্রেস, 1966।

[4] সি. ভি. রামন এবং এন. এস. নগেন্দ্রনাথ *প্রোসিডিংস অফ ইণ্ডিয়া অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স* 2, 406 ও 413 (1935); 3, 119 ও 459 (1936); নেচার 138, 616 (1936)।

নিযুক্ত করা হয়। নেচার[5] পত্রিকায় এই সব ঘটনার বিশদ বিবরণ আছে। ষাট বছর বয়স অবধি রামন এখানে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করে যান। 1948 সালে তিনি রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে চলে যান। ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের চোদ্দ বছরে তিনি যে খুব কর্মময় জীবন কাটান তা ঠিক নয়। উচ্চ কম্পাংকের শব্দ দ্বারা আলোক বিক্ষেপণ এবং হীরকের গঠন ও ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা—এই সময়ে উল্লেখযোগ্য কাজ বলতে শুধু এই।

ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের স্মৃতি রামনের কাছে ছিল বড়ই তিক্ত, এমন কি কষ্টের। যেখানে তিনি একছত্র সম্রাট নন তেমন জায়গায় কাজ করে তিনি কখনও সুখী হননি।

[5] *নেচার* 139, 1102 (1937); 140, 232 (1937)।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

রামন ইনস্টিটিউট

বাঙ্গালোরের রামন ইনস্টিটিউটের দোতলা বাড়িটি ধূসর চুনাপাথরের চেহারায় কোন রকম বাহুল্য বা অলংকরণ বর্জিত। একতলা লাল চুনাপাথরের, দেওয়াল অমসৃণ। দোতলায় কিন্তু মেঝে পালিশ করা ধূসর পাথরের। দুদিকে চওড়া বারান্দা। বড় বড় সেগুন কাঠের দরজা দিয়ে প্রচুর আলো বাতাস ঢোকে। ছাদ রিইনফোর্নড কংক্রিটের কিন্তু বারান্দার চৌকাঠ হিসেবে ছ ফুটের বড় বড় পাথরের চাঁই ব্যবহার করা হয়েছে। পাথরের দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আছে বিশাল চওড়া পাথরের সিঁড়ি। কাছেই গম্বুজওয়ালা একটি বাড়িতে মানমন্দির হবার কথা। পিছনে গাছে ঢাকা ডিরেক্টরের বাড়ী। রামনকে এখানে প্রায়ই হাঁটতে দেখা যেত। একই হাতার মধ্যে রামনের প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স। 1934 সালে এর পত্তন হয়। এখান থেকেই নিয়মিত অ্যাকাডেমির প্রসিডিংস এবং কারেন্ট সায়েন্স নামে জনপ্রিয় পত্রিকাটি প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। রামনের আমলে এই দুটি প্রকাশনা কখনও অনিয়মিত ভাবে দেখা দেয়নি। পরেও সেই একই ঐতিহ্য চলে আসছে। প্রবেশ পথে রামনের সাবধান বাণী টাঙ্গান ছিল—"এই ভবন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়। দয়া করে বিরক্ত করবেন না।" 1976 সালে বর্তমান লেখক ওখানে গিয়ে কিন্তু এই নোটিশটি আর দেখতে পান নি।

রূপকথায় পড়া যায় যাদুর বলে মানুষের গাছ কিম্বা পাথরে রূপান্তরিত হবার কথা। রামনের ভক্তিত্ব যদি মন্ত্রবলে বাড়িতে রূপান্তরিত করা যেত তাহলে সম্ভবত সেটি এইরকমই দেখতে হত। রামনের ইচ্ছা ছিল তাঁর শেষকৃত্য যেন এখানে সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে গেছেন। এই প্রতিষ্ঠান শুধু তাঁর কর্মক্ষেত্রই ছিল না তাঁর সত্তার প্রতীক।

1935 সালে মহীশূর রাজ্য তাঁকে যে 35 একর জমি দান করেন তার উপরেই ভবনটি নির্মিত হয়। এই বিরাট এলাকা ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার সামর্থ্য না থাকলে কি হবে কোথাও সযত্নের চিহ্ন দেখা যায় না। পুরান ছাত্র ও কিছু শিল্পপতির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পর 1943 সালে নির্মান কাজ সুরু হয়। সরকার থেকে রামন কখনও কোন অনুদান প্রার্থনা করেন নি এবং পানও নি। একবার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ভারতের কোন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানকে অগ্রগণ্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

রামন সম্ভবত তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানের কথা মনে রেখে উত্তর দেন, 'দয়া করে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী অনুদান দেওয়া বন্ধ করুন। তার পরেও যে প্রতিষ্ঠান টিকে থাকবে তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ধরে নেওয়া যায়।'

নির্মান কাজ শেষ হয় 1948 সালে। 1949 সালের জানুয়ারীতে রামন এর প্রথম ডিরেক্টর হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স 60। এই প্রতিষ্ঠানে পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, আবহবিজ্ঞান এবং প্রাণ রসায়নের চর্চা হয়। তবে রামনের জীবনকালে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি। পরেও হয় নি। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অধ্যক্ষ রামনের পুত্র ভি. রাধাকৃষ্ণন। তিনি একজন জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানী।

একতলার একটি ছোট কিন্তু সুনির্বাচিত বইয়ের পাঠাগার আছে। দোতলায় পড়ার ঘর। এতে আছে র‍্যালের লেখা কিছু বই যেগুলি রামন নিজে ব্যবহার করেছিলেন। তামার তৈরি রামনের একটি সুন্দর আবক্ষ মূর্তি পড়ার ঘরে শোভা পাচ্ছে। স্থানীয় শিল্পী জি. বি. ভরখেড়ী এটি তৈরি করেন।

রামনের হীরক খণ্ডের সংগ্রহ নিয়ে একটি ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহশালাও এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। স্বাভাবিক ও পালিশ করা প্রায় পাঁচশত হীরা রামন তাঁর পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে কেনেন। এশিয়ার বিভিন্ন মন্দিরের মূর্তিগুলির গায়ে অথবা ধনী ব্যক্তিদের ব্যাঙ্কের লকারে অথবা ধনী রমনীদের দেহে হীরক শোভা পায়। রামন এইসব হীরক তাঁর গবেষণাগারের জন্য সংগ্রহ করেন। লুই পাস্তুরের ভাষায় 'তাঁর গবেষণাগারই ছিল আগামী কালের মন্দির।'

হীরার ভিতরের কেলাসের গঠন এত নিখুঁত অথচ সহজ যে রামনের মতে তা সমস্ত কঠিন বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য[1]। বর্ণহীন এই ধাতুর সবটাই কার্বন পরমাণুতে গঠিত। ঘন, অষ্টফলক ও দ্বাদশপার্শ্বকের সমমাত্রিক আকারে এটি কেলাসিত হয়। কঠিন অবস্থায় সমস্ত ধর্ম এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আকারে লক্ষ্যনীয়—এটাই ছিল রামনের অভিমত। তিনি হীরার এই সব ভৌত ধর্মে এতই মোহিত হন যে একসময়ে তাঁর গবেষণাগারের প্রত্যেকটি ছাত্র হীরার কোন না কোন দিক নিয়ে পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিল—শোষণ, দ্বি-প্রতিসরণ, ফ্যারাডে প্রভাব, প্রতিপ্রভা, সংদীপ্তি চৌম্বক গ্রাহিতা, আলোক পরিবাহিতা, আপেক্ষিকতাপ, অতিবেগুনি স্বচ্ছতা প্রভৃতি। কিন্তু এইসব অণ্বেষণ থেকে কোন মৌল রহস্যের উন্মোচন হয় নি। মনে হয় কেবলমাত্র বিশুদ্ধ নান্দনিক আনন্দের জন্য রামন এই সব পরীক্ষা করিয়েছিলেন কিন্তু তাহলে ছাত্রদের এই অনর্থক কানাগলিতে ছোটাছুটি করান কেন তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না।

---

[1] সি. ভি. রামন : *দ্য নিউ ফিজিক্স, দ্য ফিলজফিক্যাল লাইব্রেরী,* নিউইয়র্ক, 1951, পৃ : 96।

প্রতিবছরই 2 অক্টোবর গান্ধীজির জন্মদিনে রামন একটি গান্ধী স্মৃতি বক্তৃতা দিতেন। তার কোন বছর অন্যথা হয় নি। 1959 থেকে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দেওয়া হয়। আমি ইনস্টিটিউট থেকে এগুলি পাইনি। তবে কারেন্ট নিউজে এগুলি কোন না কোন আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

গান্ধীস্মৃতি বক্তৃতামালার শিরোনাম

1959	আলোক, বর্ণ ও দৃষ্টি
1960	সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র
1961	হীরা
1962	মণি ও মণিবিজ্ঞান
1963	ফুলের রঙ
1964	জ্যোতির্বিদ্যার হাতছানি
1965	সবুজ পাতা
1966	চোখ ও দৃষ্টি
1967	আবহবিজ্ঞান
1968	কণ্ঠ, কথা ও ভাষা
1969	ভূমিকম্প
1970	কোচেলা ও শব্দ অনুভূতি

বিষয় বৈচিত্র্য থেকে বোঝা যায় রামনের নানা বিষয়ে আগ্রহ ছিল। এমনকি তিনি শরীর বিজ্ঞানের আওতাতেও প্রবেশ করেছেন। তবে বর্তমান স্পেশলাইজেশনের যুগে এরকম বৈচিত্র্যের আর এক অর্থ নিজের শক্তি বিক্ষিপ্ত হওয়া। একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা তাঁর জীবনের মূল্যবান সময় এভাবে ব্যয় করলে তাকে সময়ের সুব্যবহার বলা যাবে না। এইভাবে মন বিক্ষিপ্ত করা সাফল্যের সবচেয়ে বড় শত্রু।

সপ্তদশ অধ্যায়

দৃষ্টির শারীরতত্ত্ব

রামন তিনশোরও বেশি প্রবন্ধ লেখেন কিন্তু বই লেখেন মাত্র চারটি। তার মানে এই নয় যে সব বিজ্ঞানীরাই অনেক বই লিখে থাকেন। আইনষ্টাইন সামান্য কয়েকটা বই-ই লেখেন। রামনের প্রথম বইটি[1] আলোর আণবিক বিবর্তনের উপর তখনকার ধারণা নিয়ে একটি পুস্তিকা। অন্য দুটি বইয়ের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। বেতারে প্রচারিত উনিশটি প্রবন্ধের একটি সঙ্কলন, নাম 'দা নিউ ফিজিক্স'[2] অন্যটি 1941 সালে প্রদত্ত গাইকবার ফাউণ্ডেশন বক্তৃতা, কিন্তু আঠারো বছর পরে বাঙ্গালোর থেকে ছাপা 'লেকচার্স অন ফিজিকাল অপটিকস'[3]। নিউ ফিজিক্স নামে বেতার বক্তৃতার সংকলনটি 1951 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা ছাপেন—বইটি নেহাতই মামুলি। এতে এডিংটন বা জীনসের লেখার সেই প্রসাদগুণ নেই। যতদূর জানি নিউ ফিজিক্সের একটিই সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং তা অন্য কোন ভাষায় অনূদিত হয়নি। বইটিতে উল্লেখযোগ্য একটিই অংশ আছে যেখানে (3 পৃষ্ঠা) রামন আইনস্টাইন ও বর সম্পর্কে কিছু তীব্র মন্তব্য করছেন। এঁরা দুজনেই তখন জীবিত। বরকেই রামন বলেছেন এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। সম্ভবত এর কারণ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে রামনের আগ্রহ। আইনস্টাইনের চেয়ে বরের কাজেই এক্সপেরিমেন্টাল পদার্থ বিজ্ঞানের ছোঁয়া বেশি আছে। রামনের বাঙ্গালোরের বাড়ীর সিঁড়িতে দুটি ছবি দেখা যাবে—রাদারফোর্ড ও বর। আর কোন বিজ্ঞানীর ছবি সেখানে নেই।

যাই হোক উল্লিখিত তিনটি বইয়ের কোনটিতেই রামনের মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় নেই। দৃষ্টির শারীরতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর চতুর্থ বইটিতে তাঁর শেষ জীবনের গবেষণার পরিচয় আছে। এটি ছাপা হয় 1968 সালে। সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্রগুলি সবই ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের প্রসিডিংসে এবং অ্যাকাডেমির মুখপত্র কারেণ্ট সায়েন্সে প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতীয় মহলের ধারণা এই কাজই খুবই উচ্চ শ্রেণীর—হেলমহোলৎজের মত পদার্থ

---

[1] সি. ভি. রামন : *মলিকুলার ডিফ্র্যাকসান অফ লাইট*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 1922।

[2] সি. ভি. রামন : *দ্য নিউ ফিজিক্স; টক্স অন এস্পেক্টস অফ সায়েন্স*, ফিলজফিকাল লাইব্রেরি ইনক্, নিউ ইয়র্ক, 1951।

[3] সি. ভি. রামন : *লেকচারস অন ফিজিকাল অপটিক্স*, দ্য ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস, বাঙ্গালোর, 1959।

বিজ্ঞানের সঙ্গে শরীর বিজ্ঞানের সমন্বয়। কিন্তু তাঁর সহযোগী বা সহকারীদের কারোই এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করার মত যথেষ্ট জ্ঞান, বিশ্বাস বা সৎসাহস ছিল না। এই গবেষণা কোনরকম আর্ন্তজাতিক আলোড়ন তুলতে পারেনি। কথাটি শোনাচ্ছে বড় রূঢ় কারণ রামনের এই গবেষণার কিছু দূর দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

রামনের জীবন ও কাজের এই অল্প পরিচয় মূল্যায়নের পরিধিতে এই বইটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার জায়গা নেই। তবে সংক্ষিপ্তভাবে দু-চারটি মন্তব্য করা অসঙ্গত হবে না। বই থেকে আমরা কেবল নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলি আলোচনার জন্য বেছে নিলাম। এই আলোচনা হবে মূলত পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে।

(i) সাধারণভাবে দৃষ্টি এবং বর্ণের দর্শন সম্পর্কে তত্ত্ব

(ii) বর্ণ চেনার ব্যাপারে সুবেদিতা

(iii) ধ্রুবিত আলোর অনুভূতি ও কত ছোট তারের জালি খালি চোখে দেখা যায়।

(iv) নক্ষত্রের আলোর বাড়াকমা।

প্রথমেই একটি অসুবিধার কথা বলে রাখা ভাল। বার্তা পাবার সময় কোথাও রামন উল্লেখ করেন নি কাজটি তাঁর না অন্য কারো। একমাত্র পোলকের 'ভার্টিব্রেট ভিশুয়াল সিস্টেম' বইটি ছাড়া কোথাও এই কাজের উল্লেখ নেই।

(i) রঙের ত্রিবর্নী তত্ত্বকে রামন[4] ভুল মনে করতেন। তিনি ধরে নেন ত্রিবর্নী তত্ত্বের অর্থ লাল, সবুজ ও নীল এই তিনটি প্রাথমিক বর্ণ আছে। তার অর্থ অন্য যে কোন রং এই তিনটির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। হলদে রঙের অনুভূতি স্বনির্ভর নয় বলতে তাঁর আপত্তি ছিল। কিন্তু তিনি পরিবর্তে কোন থিওরি উপস্থিত করেন নি। তাঁর বক্তব্য ছিল যে সাদা আলোর বর্ণালিতে হলদেই সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ, সুতরাং এর থেকে কম উজ্জ্বল রঙের সংমিশ্রণে এই রং উৎপন্ন হতে পারে না। তবে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এটা সম্ভব। মিশ্রণের ফলে উজ্জ্বলতর অন্য রং উৎপন্ন করা যায় এবং এই রং এবং অন্য কোন নির্বাচিত রং সাদা আলোর মত দেখায়। তবে বর্ণ তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা ইয়ং[5] বলেন সবুজ ও বেগুনীর জায়গায় হলদে ও নীলকে রাখা যায়[6]। ইয়ং মনে করতেন লাল, হলদে ও নীল এই তিনটিই প্রাথমিক রং। কারণ এদের কম্পাংক 8, 7 এবং 6-এর পর্যায়ে পড়ে। গেটে মনে করতেন নীল, হলদে ও বেগুনী লালই প্রাথমিক বর্ণ।

রামনের[7] মতে "সাদা আলোর বর্ণালীতে যে কটি রং দেখা যায় সেগুলিকে আলাদা

---

[4] *ঐ*, পৃ : 27।

[5] টি. ইয়ং : *ফিলজফিকাল ট্রানস্যাকসান অফ দ্য রয়্যাল সোসাইটি*—পার্ট 1, 20, (1802)।

[6] এইচ পেরোঁ : *দ্য সেনশেসানস*, ফ্রেডারিক মুলার লিমিটেড, লণ্ডন, 1952, পৃ: 126। দৃষ্টি নিয়ে রামনের কাজ প্রথম প্রকাশিত হয় 1959 সালে, তাই এই বিষয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীর প্রামাণ্য কাজের উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

[7] সি. ভি. রামন : *দ্য ফিজিওলজি অফ ভিসন*, দ্য ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস, বাঙ্গালোর, 1968 পৃ: 27।

হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং আমাদের বর্ণ অনুভূতি এই কয়টি রঙেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ যেগুলিকে আলাদা করে চেনা যায়।" অর্থাৎ ত্রিবর্ণী তত্ত্বের বদলে রামন অসংখ্য বর্ণের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। রামন এই বইটি[8] প্রকাশ করার বহু আগেই কিন্তু এই তিন প্রাথমিক রঙের অগ্রাধিকার প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। রামন যেটা বোঝেননি তা হল ত্রিবর্ণী তত্ত্বের[9] অর্থ। 'আমাদের দেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন এক সময়ে সব উদ্দীপক আলো তাদের বর্নালী গঠন যাই হোক না কেন তিনটি চলরাশি দ্বারা নিরূপিত হবার অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। প্রতিক্রিয়ার প্রণালী পরে যাই হোক না কেন চলরাশির উদ্দীপকগুলি সেই একই দৃশ্য প্রভাব রচনা করে।' মানুষের চোখ হলদে রঙকে প্রাথমিক রং হিসেবে গ্রহণ করে এই তত্ত্ব রামনের পরীক্ষার দ্বারা আংশিক ভাবে প্রমাণ হয়। আমাদের চোখের অক্ষিপটকে (রেটিনাকে) বর্ণ অনুভূতি দেবার জন্য তিন ধরনের কোন পিগমেন্ট বা ফোটো পার্সেপটর আছে। এগুলি বেশ বড় কম্পাংকে সাড়া দেয়। তিনটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে এর সংবেদনশীলতা তীব্রতম। সেগুলি 4470 Å (নীলচে-বেগুনী), 5400 Å (সবুজ) এবং 5770 Å (হলদে)। 1960 দশকের গোড়ার দিকে পরীক্ষা করে এই সব তথ্য জানা গিয়েছিল। কাজেই রামনের তত্ত্ব যে আমরা যতগুলি দেখতে পাই ততগুলি রঙই আছে ধোপে টেকে না।

খুব সরু আলোকরশ্মি রেটিনার একটি ফটো রিসেপটরে ফেলে শোষণ বর্ণালী রেকর্ড করা গেছে। কোন রিসেপটর নীলচে বেগুনি সবচেয়ে বেশি শোষণ করে, কোনটি সবুজ, কোনটি হলদে[10]।

রামন[11] একথাও বলেন যে দৃষ্টির সব ফটো কেমিকাল থিওরি বর্জন করা উচিত কারণ হিসাবে তিনি বলেন "আলোর দ্বারা উত্তেজিত যে কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় আলোক কণার বেশ কিছুটা শক্তি নিয়ে নেবে। এর অনুপাত নির্ভর করবে প্রতিক্রিয়ার ধরন ও বর্ণালীর যে অংশে আপতিত আলো দেখা দেবে তার উপর। সেক্ষেত্রে বর্ণালীতে আলোর নিরন্তর অগ্রগতি এবং বর্ণবোধের নির্ভুলতার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।"

অবশ্যই দেখার জন্য রেটিনার কিছু শক্তি দরকার হয় তবে দেখা এবং রং চেনার প্রক্রিয়ার মধ্যেই আছে ফটো কেমিকাল—ইলেকট্রিকাল প্রক্রিয়া যার পরে অপটিক নার্ভ এবং মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়। ক্রিয়ার ফলে সামান্য শক্তি বিযুক্ত হয় ঠিকই কিন্তু তা প্রতি ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। যে শক্তির দরকার হয় তা এত অল্প যে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনার মত।[12]

[8] ই. এফ. ম্যাকজিকল (জুনিয়ার) : *সায়েন্টিফিক আমেরিকান,* 221, 49, (1968)।

[9] ডব্লু. এস. স্টাইলস : *দ্য ট্রাইক্রোমাটিক স্কিম ইন মেকানিজমস অফ কালার ডিসক্রিমিনেশান,* পারগামন প্রেস, 1960, পৃ: 187।

[10] *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা,* খণ্ড 14, 1973, পৃ: 364।

[11] সি. ভি. রামন : *ঐ,* পৃ: 33।

[12] ডব্লু. এ. ভিলে : *ফ্রম সাইট টু লাইট, অলিভার এণ্ড বয়েড,* লণ্ডন, 1968, পৃ: 27।

রেটিনার বর্ণ-সুবেদী অঞ্চলে একটি অণুতে রূপান্তর আনার জন্য এক ঝলক শক্তিই যথেষ্ট। তাছাড়া এ তো জানাই আছে যে তীব্রতা দিয়ে বর্ণ অনুভূতিতে কোন ইতর বিশেষ হয় না।

(ii) কাছাকাছি রং চেনার ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা আছে রামন[13] তার পরিমাণ হিসাব করে বার করেন। রেটিনার অণুতে তাপীয় উত্তেজনার ফলে এটা ঘটে—এই ছিল তাঁর মত। যদি ν হয় আপতিত আলোর কম্পাংক, ν' দেখা আলো এবং T রেটিনার তাপমাত্রা তাহলে রামনের হিসাব অনুযায়ী

$$h\nu' = h\nu \pm KT$$

h = প্লাকের ধ্রুবক (6.63×10^{-27} আর্গ সেকেণ্ড)

k = বোলজম্যান ধ্রুবক (1.38×10^{-16} আর্গ সেকেণ্ড ডিগ্রি$^{-1}$)

এই সমীকরণে ধরে নেওয়া হয়েছে যে রেটিনার বস্তুতে তাপীয় উত্তেজনার ফলে যে kT শক্তি নির্গত বা শোষিত হয় তাতে আপতিত ফোটনের শক্তি বাড়ে অথবা কমে। তাহলে

$$\nu' - \nu = \pm kT/h$$

রেটিনার 39° সে. = 312° কে তাপমাত্রা সব কম্পাংকে $\nu' - \nu = 6.5 \times 10^{12}$ সি পি এস = 216 তরঙ্গ সংখ্যা দেয়। রামন এটাকেই মনে করতেন বর্ণ অনুভূতির সংবেদন সীমা। বোঝাই যাচ্ছে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াতে সমস্ত আভ্যন্তরীন তাপীয় শক্তি নিযুক্ত হচ্ছে না।

তরঙ্গ সংখ্যার যে সব প্রভেদ চোখে দেখে ধরা যায় তার কিছু পরীক্ষাভিত্তিক তথ্যও উপস্থিত করেন রামন :

লালের জন্য	±	88 (6300 Å)
হলদের জন্য	±	39 (5800 Å)
সবুজের জন্য	±	174 (5400 Å)
নীলের জন্য	±	71 (4900 Å)
বেগুনীর জন্য	±	216 (4300 Å)

রামন কিন্তু এ বিষয়ে অন্যদের কাজের কোন উল্লেখই করেন নি। যেমন 1934 সালে রাইট ও পিটের[14] অনুরূপ কাজ। আরও আগে 1922 সালে একই রকম কাজ রিপোর্ট করেন পেডি[15]। সম্ভবত আগেকার এইসব অনুসন্ধানের খবর রামনের অজ্ঞাত ছিল।

তার চেয়েও জরুরী হল 216 তরঙ্গ সংখ্যার চেয়ে রামনের পরীক্ষার ফলাফলগুলি এত আলাদা কেন তার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

---

[13] সি. ভি. রামন : *ঐ*, পৃ: 33।

[14] ডব্লু. রাইট এবং এফ. এইচ. জি. পিট, *প্রোসিডিংস ফিজিকাল সোসাইটি*, 46, 459 (1934)। তা ছাড়া দেখুন পেরোঁ ; *ঐ*, পৃ: 128।

[15] ডব্লু. পেডি : *কালার ভিসান*, এডয়ার্ড আর্নল্ড, 1922, পৃ: 126।

(iii) তবে রামন[16] পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে চোখে দেখে ধ্রুবিত আলো ও ধ্রুবণ তল চেনা যায়। এই আবিষ্কার অবশ্য মৌলিক তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পক্ষে বড়ই সহজ। খালি চোখে সূক্ষ্ম জালি কতদূর দেখা সম্ভব সে বিষয়ে কাজটিও তাই। কিন্তু তারের সাইজ, জালির দূরত্ব, পশ্চাদপটের আলো ইত্যাদি সামগ্রিকভাবে বিবেচিত হয়নি।

(iv) নক্ষত্রের আলোর কমাবাড়ার উপর আলোর কণা ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা রামন ভেবেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত তাঁর এই অনুমান ঠিক ছিল না। খালি চোখে দৃশ্যমান সবচেয়ে দূরের একটি নক্ষত্রকেই নেওয়া যাক -32×10^{19} সেমি দূরত্বের প্লিয়াডিস নক্ষত্রপুঞ্জের একটি। রামন নিজেই এক জায়গায় এই নক্ষত্রপুঞ্জের উল্লেখ করেছেন। নক্ষত্র থেকে নির্গত শক্তি সূর্যের মত 3.9×10^{33} আর্গ (প্রতি সেকেণ্ডে) ধরে নেওয়া যায়। 5×10^{14} সি পি এস (6000 Å) কম্পাংকের একটি ফোটনের শক্তি $h\nu \simeq 3.3 \times 10^{-12}$ আর্গ। অতএব প্রতি সেকেণ্ডে নক্ষত্র থেকে যে সংখ্যায় ফোটন নির্গত হচ্ছে তা হল

$$3.9\times10^{33}/3.3\times10^{-12} \sim 12\times10^{44}$$

যে সংখ্যক ফোটন চোখে ঢুকছে (3.2 বর্গ সেমি খুব বিস্ফারিত অবস্থায়) তা হবে

$0.2\times12\times10^{44}/4\pi\,(32\times10^{19})^2 \simeq$ প্রতি সেকেণ্ডে 183

এই সংখ্যার ফোটন পৃথকভাবে প্রতি সেকেণ্ডে চোখে ঢুকলে রেটিনার একটি স্থায়ী ছবি ধরে রাখার কথা। যে সব নক্ষত্র আরো কাছে সেখানে ফোটনের সংখ্যা আরো বেশি হবে। নক্ষত্র আলোর স্ফুরণে বিশেষ ভূমিকা নেয় নক্ষত্রের আকার, আবহমণ্ডলের প্রতিসরণ এবং আন্তনাক্ষত্রিক বস্তু। রামন অবশ্য আবহমণ্ডলের প্রতিসরণের বদলের কথা বলেছেন, তবে সেটা গ্রহদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বড় কৌণিক ব্যাসের জন্য গ্রহগুলি মিটমিট করে না।

'ফিজিওলজি অফ ভিসন' বইটির ভূমিকায় রামন তাঁর এই সংক্রান্ত গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন

> তিনি লিখেছেন, "অতীতের ধারণা ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আমি বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করতে চেয়েছি। এই গবেষণার ফলে দৃষ্টির ধর্ম সম্পর্কে নতুন ধারনার জন্ম হল এবং আমাদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার নতুন ব্যাখ্যা সংযুক্ত হল।

শোনা যায় কোন এক সমসাময়িক ব্যক্তি রামনকে বলেন এই কাজের জন্য তাঁর আর একবার নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত। উত্তরে রামন বলেন :

> এই বইয়ের আলোচনাগুলি যুগান্তকারী কিন্তু তার মর্ম বুঝতে নোবেল কমিটির আরো কুড়ি বছর লেগে যাবে। আমি ততদিন বেঁচে থাকব না।

বর্তমান লেখককে এই কথাই বলেন ই. সি. জি. সুদর্শন। তাঁকেও নাকি রামন বলেছিলেন এই কাজ থেকে আর একটি নোবেল পুরস্কার তিনি পেতে পারেন। প্রতিভাধর ব্যক্তিদের কতরকম খামখেয়ালীপনাই না থাকে!

---

[16] সি. ভি. রামন : ঐ, পৃ: 42।

অষ্টাদশ অধ্যায়

লেসার রামন বর্ণালি

পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতি কি প্রযুক্তির উন্নতির উপর নির্ভর করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, হ্যাঁ, খুব বেশি মাত্রায় করে। তবে তাত্বিক বিজ্ঞানে হয়ত এর প্রভাব বিপরীত দিকে কার্যকরও হতে পারে। আধুনিক কণা পদার্থবিদ্যা এর একটা উদাহরণ। এ যুগের শক্তিশালী সব যান্ত্রিক উপকরণ থেকে এত তথ্য বেরিয়ে আসছে যে তত্ত্বীয় বিজ্ঞানী একেবারে দিশেহারা বোধ করছেন। মোটামুটিভাবে বলা যায় প্রযুক্তির অগ্রগতিতে পদার্থবিজ্ঞানের চর্চা অনেকটা এগিয়ে গেছে। রামন প্রভাব সম্পর্কে এটা খাটে।

রামন তাঁর পরীক্ষায় সাধারণ সূর্যালোক ব্যবহার করতেন। পরে অবশ্য মার্কারি ভেপার ল্যাম্প তাঁর প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এটা চলে 1950 সাল অবধি। আর. ডব্লু. উড ও রামনের গবেষক গোষ্ঠী অবশ্য যন্ত্রপাতিতে কিছুটা রদবদল ও উন্নতি করেন। 1950 থেকে 1960 অবধি কাজ করার জন্য এইচ. এল. ওয়েলশের মার্কারি ল্যাম্প চালু হল। টরান্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এফ. ক্রফোর্ড এটিকে আরো উন্নত আকার দেন। এগুলি ব্যবহার করে ক্ষীণ রামন বিকিরণ গুলি লক্ষ্য করা সহজ হল। কারণ এতে বেশ তীব্র ও স্পষ্টভাবে রামন রেখা পাওয়া যেতে লাগল। এই ল্যাম্প কম চাপে কাজ করে। এর থেকে নির্গত আলো বেশ তীব্র এবং পশ্চাদপটে বিকিরণ থাকে না বললেই হয়। নমুনাতে প্রবেশ করার আগে আলো একটি ফিলটারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। উদ্দেশ্য হল নমুনার রামন বর্ণালী পরীক্ষা করা। রামন বর্ণালী খুবই দুর্বল, তাই বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্রের আলো সংগ্রাহক শক্তি উচ্চ হওয়া দরকার। f/0.7 অ্যাপার্চার পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম দিকে ফোটোগ্রাফের মত বর্ণালী চিত্র নেওয়া হত, 1928 সালে রামন তাই-ই করেছিলেন। তিনি 3000 ক্যাণ্ডলপাওয়ার মার্কারি আর্ক ও 8 ইঞ্চি কণ্ডেনসার ব্যবহার করেন আলোকে তীব্রতর করার জন্য। তবু বেনজিন এবং টোলুয়েনের প্রথম বর্ণালী চিত্রের জন্য তাঁকে 40 ঘণ্টা এক্সপোজার দিতে হয়। এই কাজ কৃষ্ণানের সঙ্গে যৌথভাবে করা এবং 1929 সালে রয়্যাল সোসাইটি অফ লণ্ডনের প্রসিডিংসে প্রকাশিত হয়। মনে রাখা দরকার কোন কোন গ্যাসের ক্ষেত্রে রামন বিকীরণের তীব্রতা মূল উৎসের 10^{-8} ভাগও হয়ে থাকে।

পরে ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউব ও ইলেকট্রনিক রেকর্ডার ব্যবহার করে খুব দুর্বল রামন

বিকিরণও ধরা গেছে। তবে এই গবেষণায় বিপ্লবের সূচনা করল লেসার। পর্টো ও উড[1] এবং স্টোইশেফ[2] প্রথম 1962 সালে বিচ্ছুরিত তরল পদার্থের রামন বর্ণালী বার করার জন্য একটি পালস্‌ড রুবি মেসার ব্যবহার করেন। একটি কেলাস থেকে এখন ভাল বর্ণালী পাওয়া সম্ভব। তরলের ক্ষেত্রে 10^{-5} ঘন সেণ্টিমিটার হলেই রেকর্ড করা সম্ভব। পালস-গণন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যারেট ও অ্যাডামস[3] ফোটো বৈদ্যুতিক উপায়ে আবহমণ্ডলের চাপে 10^{-8} সিসি নাইট্রোজেন গ্যাসের বর্ণালী রেকর্ড করেন। কয়েক বছর আগে আকাশে শক্তিশালী নাইট্রোজেন লেসার রশ্মি দিয়ে 1.2 কিলোমিটার দূরের নাইট্রোজেন (N_2) এবং অক্সিজেন (O_2) অর্থাৎ বাতাসের উপাদানের রামন বিকীরণের চিহ্ন পান লিওনার্দ[4]। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল বুরো অফ স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে একটি রামন পত্রিকা[5] প্রকাশিত হয়। লেসার ভিত্তিক রামন বর্ণালী বিজ্ঞানের সব খবরাখবর এতে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন অণুর পরমাণু কেন্দ্রকের স্পন্দনে যে কোয়াণ্টাম অবস্থা প্রকট হয় সেগুলি সম্পর্কে গবেষণা করার মস্ত বড় হাতিয়ার এই রামন প্রভাব। শিল্পে ব্যবহৃত পলিমারের বিশদ ও মূল্যবান বর্ণালী চিত্রও এইভাবে পাওয়া গেছে। কঠিন বস্তুর উপরিতলে শোষিত স্তরের রামন বর্ণালীও নেওয়া গেছে। এই পদ্ধতি বেশ সুবিধাজনক এবং এতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেসব রসায়নবিদ শিল্পে নিযুক্ত আছেন তাঁদের কাছে লেসার রামন বর্ণালী খুবই কাজের বস্তু। শোনা যায় শেষ জীবনে রামন নাকি মনে করতেন তাঁর আবিষ্কারের উল্লেখ না থাকলে পদার্থবিজ্ঞানের কোন বই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কথাটার মধ্যে একটু অতিরঞ্জন থাকলেও এই দাবি একেবারে নিরর্থক নয়।

[1] পি. এস. পর্টো ও ডি. এল. উড : *জার্নাল অপটিক্যাল সোসাইটি,* আমেরিকা, 52, 251 (1962)।

[2] বি. পি. স্টোইশেফ : *টেন্‌থ ইন্টারন্যাশনাল স্পেকট্রোস্কপি কলোকুয়াম,* মেরিল্যাণ্ড ইউনিভার্সিটি 1962 স্পার্টান বুক্স, ওয়াশিংটন, 1963।

[3] জে. জে. ব্যারেট ও এস. আই. অ্যাডামস : *জার্নাল অপটিকাল সোসাইটি,* আমেরিকা 58, 311 (1968)।

[4] ডি. এ. লিওনার্ড : *নেচার,* 216, 142 (1967)।

[5] সম্পাদক ডঃ পি. আর. ওয়েকলিঙ, রুম 24 সি, 1500 ম্যাসাচুসেটস এভেনিউ এন. ডব্লু., ওয়াশিংটন ডি. সি., 20005।

উনবিংশ অধ্যায়

প্রভাব বিষয়ে সংযোজন

শেক্সপিয়রের আন্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রা নাটকে জ্যোতিষী চরিত্রটির মুখ দিয়ে অনেকটা আধুনিক বিজ্ঞানীদের আদর্শের কথাই বলা আছে : 'প্রকৃতির রহস্যময় বইটির অল্পই পাঠোদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব।' প্রকৃতির রহস্যের কোন অন্ত নেই। বিজ্ঞান তারই কিছু উন্মোচন করে চলেছে। কিন্তু এই আবিষ্কারের কোন শেষ নেই।

1928 সালে রামন বা কৃষ্ণান কেউ তাঁদের আবিষ্কারের সুদূর প্রসারী সম্ভাবনার কথা বুঝতে পারেন নি। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রামন লেসার বর্ণালিবিদ্যা প্রয়োগ করে কোটি টাকার কারবার চলছে[1]। উদ্দীপ্ত রামন-প্রভাব বার করার জন্য লেসারও ব্যবহার করা হচ্ছে। আগের অধ্যায়েই একবর্ণী বিকিরণের উৎস হিসেবে লেসারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নশক্তি লেসারে রামন লাইনের তীব্রতা ও লেসার উৎসের সম্পর্ক 10^{-4} থেকে 10^{-6} (কেবল তরলের ক্ষেত্রে)। লেসারের শক্তি বেড়ে একটি বিশেষ সীমা পার হবার পর উদ্দীপ্ত রামন-রেখার তীব্রতা উৎসের প্রায় সমান হয়ে যায়। এর কারণ উপযুক্ত বিকিরক বস্তু থেকে উদ্দীপ্ত নিঃসারণ। উদ্দীপ্ত নিঃসারণ ঘটাবার জন্য লেসার উৎসের শক্তি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে কয়েক মেগাওয়াট হওয়া দরকার। 1962 সালে উডবারি এবং এন. জি.[2] আকস্মিকভাবে উদ্দীপ্ত রামন-প্রভাব আবিষ্কার করেন। বিক্ষেপকের উত্তেজনা হিসেবেও এটি দেখা যায়। এর কাজ গৌণ লেসারেরই অনুরূপ। অবশ্য এর ফলাফল অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য দেখা যায়—কয়েক ন্যানোসেকেণ্ড (এক ন্যানোসেকেণ্ড অর্থাৎ 10^{-9} সেকেণ্ড)। শক্তির এই অতি ছোট ঝলক দিয়ে স্পন্দিত অণুর উত্তেজনার স্থায়িত্বকাল মাপা যায়।

একবর্ণী লেসার রশ্মির শক্তির ফ্লাক্স যদি তার প্রারম্ভ সীমার মানের চেয়ে কম হয় তাহলে বিক্ষেপক অণুগুলিকে উত্তেজিত করে লেসারের মত আচরণ করান যাবে না। তবে রশ্মি শক্তিশালী হলে নানারকম ঘটনা ঘটবে। লেসার রশ্মির কম্পাংক ν হলে এবং বিক্ষেপক থেকে বিকিরিত আলো 2ν কম্পাংকে লক্ষ্য করলে অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনা দেখা যাবে। কিছু বিচ্ছুরকে ν কম্পাংকে কোন রামন-প্রভাব দেখা যায় না, কিন্তু দ্বিগুণ কম্পাংকে লক্ষ্য

[1] আর. এস. কৃষ্ণান : *সায়েন্স টুডে*, ডিসেম্বর, 1970, পৃ: 32।

[2] ই. জে. উডবারি ও ডব্লু. কে. এনজি : *প্রসিডিংস ইনস্টিটিউট অফ রেডিয়েশান ইঞ্জিনিয়রিং*, 50, 2367 (1962)।

করলে $2\nu \pm \nu'$ কম্পাংকের রামন লাইন বেশ ভালভাবে প্রকট হয়। একে বলা হয় হাইপার-রামন-প্রভাব। রুবি লেসারের সাধারণ কম্পাংকের দ্বিগুণ কম্পাংকের কাছে টারহিউন[3] ও তাঁর সহকারীরা জল ও কোয়াজে প্রথম এই প্রভাব লক্ষ্য করেন। হিসেব করে দেখা হয় অতি বিক্ষিপ্ত বিকিরণের শক্তি উৎসের 10^{-13} গুণ। এতেই বোঝা যাচ্ছে আজকাল মাপজোখে কতদূর সূক্ষতা এসেছে।

স্টোইশেফ ও জোনস[5,6] বিপরীত রামন প্রভাবের ছবি তোলেন। তাঁরা এর কথা আগে অনুমানও করেছিলেন। তীব্র একবর্ণী রশ্মি (ν) এবং নিরবচ্ছিন্ন কম্পাংকের (ν সহ) রশ্মি বিক্ষেপকের দিকে প্রেরণ করলে তার অণুগুলি থেকে উদ্দীপ্ত নিঃসারণ হিসেবে ν কম্পাংকের বিকিরণ দেবে এবং সেই সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালি থেকে $\nu+\nu'$ ও $\nu-\nu'$ কম্পাংকের আলো শোষণ করবে। বিক্ষেপক অণু থেকে যে স্বাভাবিক রামন নির্গত হয় এই শোষন তার ঠিক বিপরীত।

লেসার উৎস ব্যবহার করে নানা রকম নতুন ধরনের উত্তেজনার খবর পাওয়া গেছে— যেমন চৌম্বক অবস্থা, সেমিকণ্ডাকটার, পোলারিট্রন, ল্যাণ্ডাউ স্তর ও ওজে প্রসেস থেকে রামন বিক্ষেপণ।

নতুন পরীক্ষার অর্থই হল থিওরিকে নতুন চোখে দেখা এবং তার সম্ভাবনা বিচার করা যাতে আরও নতুন ঘটনা ও পরীক্ষার দরজা খুলে যায়। রামন বিক্ষেপণের সম্ভাবনা এখনও নিঃশেষ হতে দেরী আছে।

কবি শেলীর কথায় একজন বিজ্ঞানী সর্বদাই অনাবিষ্কৃত দেশে আশ্চর্য সত্যের সন্ধানী। (অ্যালাসটর, 77 লাইন)

রামন তাঁর দীর্ঘজীবনে এইসব প্রগতির অনেকটাই দেখে যান। কাজেই তাঁর জীবন ফলপ্রসূ হয়েছিল এই বোধ অর্জন করার তাঁর অধিকার ছিল।
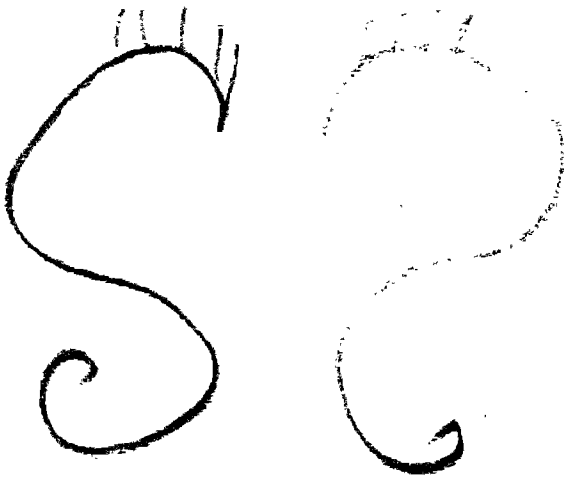
[3] আর. ডব্লু. টারহিউন প্রভৃতি : *ফিজিকাল রিভিউ লেটার্স,* 14, 681 (1965)।

[4] টি. আর. গিলসন ও পি. জে. হেন্ড্রা : *লেসার রামন স্পেক্টস্কপি,* উইলি ইন্টারসায়েন্স, 1970, পৃ: 195।

[5] বি. পি. স্টোইশেফ : *ফিজিকাল রিভিউ লেটার্স,* 7, 186 (1961)।

[6] ডব্লু. জে. জোনস ও বি. পি. স্টোইশেফ : *ফিজিকাল রিভিউ লেটার্স,* 13, 657 (1964)।

বিংশ অধ্যায়

বিতর্ক

ওথেলোর সহচর ইয়াগো বলেছিল "কোন কোন লোককে দেখে যা মনে হয় তাদের সেরকমই হওয়া উচিত।" রামনকে দেখে যা মনে হত তিনি সেরকমই ছিলেন। মোটামুটিভাবে স্বভাবে তিনি ছিলেন রুক্ষ। অনেকবার বিনা আয়াসে তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। নিজের ধারণা সম্পর্কে তাঁর অনমনীয় মনোভাব তিনি কোন অবস্থাতেই বিসর্জন দিতেন না।

1934 সালে তিনি অধ্যাপক ম্যাক্স বর্নকে বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। হিটলারের জার্মানী থেকে নির্বাসিত ম্যাক্স বর্ন তখন কেমব্রিজে ছিলেন। রামন তখন বাঙ্গালোর ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। বর্নের হাঁপানির অসুবিধা ছিল তাই প্রথমটা তিনি স্বাস্থ্যের কারণে আসতে অস্বীকার করেন। পরে অবশ্য পীড়াপিড়িতে রাজী হয়ে তিনি 1935-36 এর শীতকালটা ইনস্টিটিউটে কাটান। প্রসঙ্গত শ্রয়ডিংগারের কাছে এই নিমন্ত্রণ একটু দেরীতে পৌঁছয় এবং 'উপনিষদের দেশে' না যাবার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। ম্যাক্স বর্ন যে সব বক্তৃতা দেন তার মধ্যে ছিল ক্রিষ্টাল-ল্যাটিসে গতিবিদ্যা সম্পর্কে একটি কোর্স। রামন এই বক্তৃতা নিয়মিতভাবে শুনতে যেতেন। বর্ন ছিলেন এ বিষয়ে একজন পথিকৃৎ। 1912 সালে তিনি কারম্যানের সঙ্গে এ বিষয়ে নতুন কাজ শুরু করেন এবং সমারফেল্ডের অনুরোধে বিখ্যাত এনসাইক্লোপেডি ডার ম্যাথম্যাটিশেন ভিসেনশ্যাফটেনের 1923 সংস্করণে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। বর্ন যেভাবে ল্যাটিস-ধর্ম হীরার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন তা এই বিষয়ে বিরাট অগ্রগতি বলে মনে করা হয়। কেমার ও শেলাপের মতে বর্ন এই বিষয়ের জনক বলে গণ্য হতে পারেন।[1]

চল্লিশের দশকে রামন নিজেই কেলাস ল্যাটিসের গতিবিদ্যা নিয়ে একটি তত্ত্ব প্রস্তুত করেন। বর্ন আইনস্টাইনকে লিখিত একটি ব্যক্তিগত পত্রে[2] এই থিওরিকে অত্যন্ত কাঁচা বলে অভিহিত করেন। পরীক্ষার কাজে রামনের দক্ষতা ছিল সন্দেহাতীত, কিন্তু তাঁর গণিতের জ্ঞান কিছুটা সীমিত হওয়ার দরুন তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অধিকার তেমন হতে পারেনি। দিল্লির ন্যাশনাল ফিজিকাল ল্যাবরেটরীর বর্তমান ডিরেক্টর, ডঃ ভার্মা বলেন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় রামন নাকি বলেছিলেন, "আমি অঙ্কের যে সিরিজটি বুঝি তা হল ফুরিয়ার

---

[1] *বায়োগ্রাফিকাল মেমোয়ার্স অফ ফেলোস অফ দি রয়্যাল সোসাইটি,* লণ্ডন খণ্ড, 17 (1971) পৃ: 24-32।

[2] *দি বর্ন-আইনস্টাইন লেটার্স,* ম্যাকমিলান, 1971, পৃ: 167।

সিরিজ।" ফুরিয়ার সিরিজ সত্যিই অসাধারণ। এর মেট্রিক গঠনের জন্য ম্যাক্সওয়েল একে গাণিতিক কবিতা বলে অভিহিত করতেন। তবে বর্ন (এবং ভন কারমেনের)[3] 1912 সালে প্রকাশিত প্রথম পেপারটিতেও শুধু ফুরিয়ার সিরিজ নয় ত্রিমাত্রিক ফুরিয়ার বিশ্লেষণের বহুল প্রয়োগ ছিল। তাছাড়াও আরও নানা জটিল গাণিতিক ধারণা ছিল যেমন জটিলতা সৃষ্টিকারী উপরিতল প্রভাব দূর করার জন্য 'পর্যাবৃত্ত' সীমাবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি।

রামনের দীর্ঘকালের সহকারী আর. এস. কৃষ্ণান[4] তাঁর গুরুর মৃত্যুর পর শ্রদ্ধা নিবেদন করে স্বীকার করেন যে 'ল্যাটিস গতিবিদ্যায় বর্নের তৈরী তত্ত্বই সার্বিক সমাধান। রামনের তত্ত্ব কেবল তারই বিশেষ অবস্থা'। কিন্তু রামন এই নিয়ে খুবই স্পর্শকাতর ছিলেন এবং অর্থহীন জেনেও তীব্র আপত্তি জানাতে দ্বিধা করতেন না। নীচের ঘটনাটি তার একটি উদাহরণ। 1948 সালের এপ্রিলে রামন এবং বর্ন দুজনেই ফ্রান্সের বোর্দোতে রামন প্রভাবের উপর একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত হন। আলোচ্য বিষয় ছিল 'দিফিউশন মলিকিউলেয়ার দা লা লুমিয়ের লাফেক্ট রামন'। দুজনেরই এই সভায় সম্মানিক ডক্টরেট পাবার কথা ছিল। বর্ন তখনো নোবেল পুরষ্কার পাননি। ল্যাটিস গতিবিদ্যা নিয়ে বর্নের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের কথা রামন ভোলেন নি। তিনি এই সুযোগে সর্বসমক্ষে বর্নকে হেয় করে কিছু বলেন। বর্নের লেখাতে তার এই রকম বর্ণনা আছে[5] :

> 'বোর্দোতে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধল। উনি যেসব তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাতে হাত দিচ্ছেন তাঁদের একচোট নিলেন'। তখন আমি বললাম—আর যেসব এক্সপেরিমেণ্টাল বিজ্ঞানীরা তত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করছেন! এতে রামন রেগে অগ্নিশর্মা হন। ভোজসভায় আমার স্ত্রী তাঁর পাশে বসেছিলেন। রামন বলেন আমি নাকি তাঁকে এত অপমান করেছি যে তিনি উঠে চলে যাবেন। আমার স্ত্রী তাঁকে বহুকষ্টে আটকান। এই মনকষাকষি কিন্তু সমস্ত সম্মেলনেই ছিল।

পরে 1954 সালে বর্ন নোবেল পুরষ্কার পেলেও রামন এই দম্পতিকে যতটা সম্ভব পরিহার করে চলতেন। জার্মানীতে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ীদের সভায় এই অভিজ্ঞতার কথা ম্যাক্স বর্নের লেখা থেকেই পাওয়া যায়। রামন হিংসার বশবর্তী হয়ে এরকম আচরণ করতেন মনে হয় না। সম্ভবত এর কারণ হল তাঁর নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দিতা প্রবণ স্বভাব।

44 বছর ধরে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো থাকার পর কোন কারণ না দেখিয়ে 1968 সালে রামন পদত্যাগ করেন। আর. এস. কৃষ্ণানের কাছ থেকে জানা যায়[6] দৃষ্টির শরীরতত্ত্ব বিষয়ে রামনের পাঠানো প্রবন্ধটি রয়্যাল সোসাইটি থেকে ফেরত আসে। (17 অধ্যায়ে এই

[3] *এম. বর্ন ও ভন কারমেন ফিজিক জাইটস*, 13, 297 (1912)।
[4] আর. এস. কৃষ্ণান : *জার্নাল সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ*, 30, 7 (1971)।
[5] *দি বর্ন-আইনস্টাইন লেটার্স*, পৃ: 166।
[6] আর. এস. কৃষ্ণান : *জার্নাল সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ*, 30, 7 (1971)।

কাজটির বিষয়ে বলা হয়েছে)। তখন রামন পদত্যাগপত্রটি পাঠান। সোসাইটির দপ্তরে এই চিঠিটি আছে। ন্যাশনাল ফিজিকাল ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টর ডঃ ভার্মা বলেন যে রামনের চিঠিটি যখন সভায় পড়া হয় তখন সেখানে বিরাজ করছিল স্তম্ভিত নীরবতা। ঘটনাটি তিনি শোনেন সোসাইটির প্রথম মহিলা ফেলো, বিখ্যাত এক্স-রে কেলাসবিজ্ঞানী ডেম ক্যাথলীন লন্সডেলের মুখে। অনেক কেলাসবিজ্ঞানী হীরা নিয়ে কাজ করেছেন—লন্সডেল তাঁদের অন্যতম। তিনি হীরায় কার্বন পরমাণুর মধ্যে দূরত্ব সাত স্থান পর্যন্ত সঠিকতার নিরূপণ করেন। তবে রামনের মৃত্যুর পর 1970 সালে সোসাইটি ভদ্রতা করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যদিও প্রকৃত অর্থে রামন তখন আর ফেলো ছিলেন না। এস. ভাগবন্তম রামনেরই কৃতী ছাত্র এই স্মৃতিচারণটি লেখেন। ভাগবন্তম[7] রামনের জীবন ও কাজ নিয়ে একটি ছোট পুস্তিকাও লিখেছেন—তার সবটাই অবশ্য প্রশংসাতে পূর্ণ।

1948 সালের পরে রামন ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে বড় একটা যোগদান করেন নি। এই কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন রাজনীতিকরা—এতেই ছিল তাঁর আপত্তি। সভাপতি অসুস্থ হয়ে পড়লে রামন 1948 সালে আর একবার সভাপতি হন। যে রাজনীতিক 1949 থেকে 1964, তাঁর মৃত্যুকাল অবধি এই কংগ্রেসের উদ্বোধন করেছেন তিনি জওহরলাল নেহরু। তবে তাঁর সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিল না একথা বলা যায় না। তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে ন্যাচরাল সায়েন্স ট্রাইপোস পাশ করেন। 1947 সালে স্বাধীনতার আগে নেহরু দুবার সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন যা কোন বিজ্ঞানীও কখনো হননি। নিজে পেশায় বিজ্ঞানী না হলেও ভারতীয় বিজ্ঞানের উপর নেহরুর ব্যাপক প্রভাব ছিল[8]। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা তাঁর মধ্যেই ছিল। এদিক দিয়ে সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র বারট্রাণ্ড রাসেলই তাঁর সঙ্গে তুলনীয়। নেহরু নিজের উপস্থিতি সম্পর্কে সবিনয়ে বলেছেন :

> 'আমি এখানে কেন আসি? আমি আসি কারণ আমার স্থির বিশ্বাস আমার উপস্থিতি দিয়ে আপনাদের কোন উপকার না হলেও অন্যদের উপকার হবে। আমি ভারতবর্ষের জনগণের কথাই বলছি। যারা বিজ্ঞান বিষয়ে ততটা উৎসাহী নয়। এইজন্য আমার আসার মূল্য আছে।'

1958 সালের সায়েন্স কংগ্রেসে নেহরু এই উক্তি করেন।

একবার নেহরু বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের উদ্দেশ্যে বলেন তাঁরা গজদন্ত মিনার থেকে বেরিয়ে আসুন। অর্থাৎ তাঁরা দেশ গড়ার কাজে সাহায্য করুন। স্বভাবসিদ্ধ কড়া ভাষায় রামন এর উত্তরে বলেন :

---

[7] এস. ভগবন্তম : *প্রফেসার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন,* দি অন্ধ্র অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস, হায়দ্রাবাদ 1972।

[8] জি. এইচ. কেশবানী : *জওহরলাল নেহরু এণ্ড সায়েন্স,* বি. আর. নন্দ সম্পাদিত *সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি ইন ইণ্ডিয়া,* নিউদিল্লি 1977।

'যাঁরা গজদন্ত মিনারবাসী তাঁরাই আসল কাজের লোক। এঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুণীজন। সভ্যতার অগ্রগতির জন্য অন্যেরা এঁদের কাছে ঋণী'[9]।

আসল কথাটা হল গজদন্ত মিনারের ভিতরটা ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে এবং অনেক উঁচু। এর অধিবাসীরা যদি মাঝে মাঝে তার থেকে নেমে মাটির কাছাকাছি আসেন তাহলে ক্ষতি কি আছে? রামন নিজেও কি জীবনের শেষদিন অবধি ভারতে বিজ্ঞানের গঠনের কাজে ব্যস্ত থাকেননি?

জাতীয় গবেষণাগারগুলির উপর বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় রামনের পছন্দ ছিল না। তিনি এগুলিকে বলতেন আস্তাবল। একবার বিরক্তভাবে তিনি মন্তব্য করেন, 'শাহজাহান যেমন তাজমহল বানান তাঁর প্রিয় মহিষীকে কবর দেবার জন্য তেমনি জাতীয় গবেষণাগারগুলি হল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কবরখানা।' অথচ বিজ্ঞান নীতি নির্দ্ধারণ বিষয়ে কোনভাবে তিনি অংশ নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ভারত সরকারের বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। 1938-40 সালে নেহরু যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির চেয়ারম্যান হন তার সদস্য হতেও তিনি অস্বীকার করেন। নেহরুর বিজ্ঞান নীতির সমর্থক ছিলেন না রামন। কিন্তু তবু নেহরু তাঁকে 1948 সালে জাতীয় অধ্যাপক করেন, এবং 1954 সালে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ভারতরত্নে ভূষিত করেন।

অনেকে মনে করেন যে আবিষ্কারটি এখন রামনের নাম বহন করছে তার সহযোগী হিসেবে কে. এস. কৃষ্ণানের কাজের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ছিল। বছরের ক্রমানুসারে এদের প্রকাশিত কাজের তালিকাটি দেখা যাক।

(i) সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান, নেচার 121, 501 (1928)। সম্পাদকের কাছে শীর্ষক এই পত্রটি 16 ফেব্রুয়ারী 1928 তারিখে লিখিত। এটি প্রকাশিত হয় 31 মার্চ, 1928 সালে। এই চিঠিতে আবিষ্কারের কথা এইভাবে বলা ছিল, "আপতিত রশ্মির সমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাধারণ অস্পষ্ট বিকিরণের সঙ্গে থাকে নিচু কম্পাংকের সংশোধিত বিক্ষিপ্ত বিকিরণ...এই প্রভাব যে আসলে বিক্ষেপণ এবং প্রতিপ্রভা নয় তা প্রমাণ হয় দুভাবে। প্রথমত সাধারণ বিক্ষেপণের চেয়ে এটি ক্ষীণ এবং দ্বিতীয়ত এর ধ্রুবণ। অনেক ক্ষেত্রে এটি বেশ জোরদার এবং সাধারণ বিক্ষেপণের ধ্রুবণের সঙ্গে তুলনীয়। (পরিশিষ্ট I ও II দ্রষ্টব্য)

(ii) সি. ভি. রামন, নেচার, 121, 619 (1928) এই চিঠির তারিখ 8 মার্চ, 1928 এবং প্রকাশিত হয় 21 এপ্রিল, 1928

(iii) সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান, নেচার, 121, 711 (1928)। এর তারিখ 22 মার্চ, 1928 এবং ছাপা হয় 5 মে, 1928

(iv) সি. ভি. রামন, ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স, 2, 387 (1928) বোঝাই যায় 31 মার্চ, 1928 তারিখের পরে প্রাপ্ত। প্রবন্ধের 398 পৃষ্ঠার টিকা দ্রষ্টব্য। এই পেপারে কে. এস. কৃষ্ণানের মূল্যবান সহযোগিতার উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[9] *সায়েন্স টুডে*, বম্বে, ডিসেম্বর 1970।

(v) সি. ভি. রামন ও কে. এস কৃষ্ণান, ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স, 2, 399 (1928) 7 মে, 1928 তারিখে প্রকাশের জন্য প্রাপ্ত।
(vi) সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান, নেচার, 122, 12 (1928)
(vii) সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান, নেচার, 122, 168 (1928)
(viii) সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান, নেচার, 122, 278 (1928)
(ix) সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান, নেচার, 122, 882 (1928)
(x) সি. ভি. রামন ও কে. এস. কৃষ্ণান, প্রসিডিংস অফ রয়্যাল সোসাইটি (A) 122, 23 (1929)

আবিষ্কার সংক্রান্ত এই দশটি খবরের মধ্যে মাত্র দুটি একা রামনের। চার নম্বরের দীর্ঘ প্রবন্ধটি তিনি বেশ ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের নামে প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় পেপার, যেটি রামন একা লেখেন তাতে কৃষ্ণানকে সহযোগী হিসাবে উল্লেখ আছে। তখনো রামন আবিষ্কারটি সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে আনতে পারেন নি কারণ তাঁর নিজের কথায়, "প্রাথমিক চাক্ষুষ পরীক্ষা থেকে মনে হয় যে সংশোধিত প্রধান লাইনগুলির অবস্থান সব বস্তুতেই এক।" ঘটনার আসল রূপ তখনো তাঁর নিজের কাছেই ধরা পড়েনি। চার নম্বর প্রবন্ধের শিরোনামায় যা আছে তখনো তিনি সেটাই বিশ্বাস করছিলেন যে তিনি একটি নতুন ধরনের বিকিরণ আবিষ্কার করেছেন যা সমস্ত বস্তু থেকে একই কম্পাংকে বার হয়। তিন নম্বর সংবাদে অর্থাৎ 'নেচারে' প্রকাশিত তাঁদের যুগ্ম চিঠিতে কৃষ্ণানই তাঁকে ঠিক পথে চালিত করেন যে "সব অণুতে কম্পাংক পরিবর্তন এক নয়।" এই চিঠিতেই ঘটনাটির যথার্থ ব্যাখ্যা এইভাবে দেওয়া হয় :

> আংশিক অথবা সম্পূর্ণ তরলের অণু বিকিরণের আপতিত কোয়ান্টাম বিক্ষিপ্ত করতে পারে। সম্পূর্ণ থাকলে মূল কম্পাংক ও আংশিক হলে বর্ধিত কম্পাংক হবে। কম্পাংকের কম হওয়া আণবিক অব-লোহিত শোষক লাইনের কম্পাংকের মতই। এটা ব্যাখ্যার পক্ষে একটি প্রমাণ।

প্রসঙ্গত ল্যাণ্ডসবার্গ ও মেণ্ডেলশ্যাম নামে দুই রাশিয়ানের 6 মে, 1928 তারিখের প্রবন্ধ জার্মান পত্রিকা নাটুর ভিসেনশ্যাফটেনে প্রকাশের জন্য পৌঁছয় ঐ বছরেরই 13 জুলাই। এ বিষয়ে 13 অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এই প্রবন্ধে ইতিমধ্যেই নেচারে প্রকাশিত রামনের কাজের উল্লেখ করা হয়েছে।

মনে হয় রামন কৃষ্ণানের উপর বেশিরকম নির্ভর করতেন। এই নতুন প্রভাব বিষয়ে বড় প্রবন্ধটিতে কৃষ্ণান তাঁকে অনেক সাহায্য করেন। এটি আগের তালিকার দশ নম্বর, 7 আগস্ট, 1928-এ প্রেরিত। ঐ বছরই কৃষ্ণান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দা কালটিভেশান অফ সায়েন্স ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। ফলে দুজনের সহযোগিতার ঐখানেই সমাপ্তি। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় ভাগ আর লেখা হয়ে ওঠেনি।

প্রথম চিঠিটি (এক নম্বর) যেটি 16 ফেব্রুয়ারী নেচারে পাঠান হয় তাতেই আবিষ্কারের

প্রথম খবরটি ছিল। রামনের তখনকার সহকারী রামদাস[10] ঘটনাটির এই রকম বর্ণনা দিয়েছেন : 'পরীক্ষা এগোবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট প্রবন্ধে (তালিকায় 1, 2 এবং 3) নেচারে এই খবরগুলি প্রকাশিত হতে লাগল। আবিষ্কারটির ঘোষণা হয় 28 ফেব্রুয়ারী, 1928। আবিষ্কারটির প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হয় বাঙ্গালোরে দক্ষিণ ভারতীয় সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সভায়। রামন সেখানে তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই বিবরণ দেন 14 মার্চ, 1928। বক্তৃতার নাম ছিল—এক নতুন বিকিরণ। (তালিকার 4 নম্বর)। কলকাতায় ফিরে তিনি তৎক্ষণাৎ এটি লিখে ফেলেন এবং রাতারাতি ছাপিয়ে ফেলেন। এই অভিনব বক্তৃতার হাজার হাজার কপি পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠানো হয়।"

(এ বিষয়ে আরও জ্ঞাতব্যের জন্য পরিশিষ্ট VII দেখুন।)

[10] এল. এ. রামদাস, ও সি. ভি. রামন, *পার্ট II, জার্নাল অফ ফিজিক্স এডুকেশান*, মার্চ, 1973।

একবিংশ অধ্যায়

মানুষ হিসাবে

জাতি, ধর্ম ও ভাষার বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষকে পৃথিবীরই একটি ছোট সংস্করণ বলা যায়। আগেই বলেছি যে চোদ্দটি স্বীকৃত ভাষা যেখানে সে দেশ যে এক ও অভিন্ন এটাই মহা আশ্চর্যের বিষয়। সব ভারতীয়দের মধ্যেই এই স্বজাত্যবোধ আছে। কবি ইকবালের বিখ্যাত পংক্তিটি স্মরণীয়—'কুছ বাত হ্যায় কি হস্তি মিটাতি নহী হমারি'—ভারতের মধ্যে এমন কিছু আছে যা বিনাশের ঊর্দ্ধে।

তাই 1970 সালের 21 নভেম্বরের সকালে যখন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয় রামন চির-দিনের জন্য চলে গেলেন তখন সারা ভারত শোকে মুহ্যমান হয়ে যায়। শুধু যে একজন নোবেল পুরস্কার জয়ী বিজ্ঞানীর মৃত্যুতে এই শোক তা কিন্তু নয়। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন তাঁর শোকবার্তায় বললেন :

> আমার পুরান এবং প্রিয় মিত্র রামনের মৃত্যু সংবাদে গভীরভাবে মর্মাহত। এ দুঃখ আমার অত্যন্ত ব্যক্তিগত। বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী রামন তাঁর অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা দিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মের ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অণুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন।

রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি শোক প্রকাশ করে বলেন,

> যে বিরাট বিজ্ঞানী দেশকে মর্যাদা এনে দিয়েছেন তিনি আজ চলে গেলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি বিজ্ঞানের প্রগতিতে একনিষ্ঠ ছিলেন এবং দেশের যুবসম্প্রদায়কে গবেষণায় উৎসাহ দিয়ে এসেছেন।

তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন,

> ডঃ রামনের মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হল। শেষ মুহূর্ত অবধি তিনি বিজ্ঞানের কাজে সক্রিয় ছিলেন। আমাদের অগণিত যুবকের তিনি ছিলেন প্রেরণাস্থল। আমাদের দেশের বিজ্ঞানের নাম তিনি বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল করেছেন। পদার্থ বিজ্ঞানে অবদানের জন্য তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছেন। উজ্জ্বল মনীষা ও স্বভাবের অধিকারী ছিলেন তিনি। তরুণদের কাছে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দিতে কখনও তিনি ক্লান্ত হতেন না।

তখনকার পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ বিক্রম সারাভাইয়ের কথায় ভারতের সমস্ত বিজ্ঞানীর মনের ভাব মূর্ত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন,

> ডঃ রামনের মৃত্যুতে ভারত তার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে হারাল। আমাকে তিনি অণুপ্রাণিত করেছিলেন এবং আমার মত আরো যাঁরা তাঁর ছাত্র ও সহকর্মী হিসেবে তাঁর কাছে আসার সুযোগ পেয়েছি প্রত্যেকেই তাঁর কাছে ঋণী। প্রাকৃতিক রহস্য উদঘাটনে তাঁর কৌতূহল ছিল শিশুদের মত। এরকম কৌতূহল

যাদের আছে তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অগাধ। এরকম গুণ সব বৈজ্ঞানিকের মধ্যে দেখা যায় না। আলোক বিক্ষেপণে তাঁর মহৎ আবিষ্কারের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হয়।

1970 সালের 22 ও 23 সেপ্টেম্বর সংখ্যার স্টেটসম্যানে তাঁর জীবনী প্রকাশিত হয়। অন্য সংবাদপত্রের সঙ্গে দ্য ট্রিবিউন এই প্রয়াত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিকাগুলিতেও বিজ্ঞানী ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা রামনের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এগুলি হল ডিসেম্বর 1970-এর সায়েন্স টুডে, ডিসেম্বর সংখ্যার ভবন্‌স জার্নাল, ডিসেম্বর সংখ্যার ফিজিক্স নিউজ, জানুয়ারী 1971 সালের জার্নাল অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ, ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল 1971 সালের এভরি ম্যানস সায়েন্স, মে 1971 সালের কারেন্ট সায়েন্স এবং মে 1971 সালের সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার। তাঁর ছাত্র ও সহযোগীদের প্রায় পঞ্চাশ জন এইসব শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তাঁর কীর্তির কথা আলোচনা করেন, জীবনের নানা কথা বলেন, তাঁর কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেন এবং রামনের কাজের মূল্যায়নের পক্ষে জরুরী উপাদান প্রকাশ করেন। তবে মানুষ হিসেবে রামনের চরিত্রের গভীরতা বা খামখেয়ালিপনা কোনটিরই সম্পূর্ণ পরিচয় এগুলি থেকে পাওয়া যায় না।

বড়ই আশ্চর্য মানুষ ছিলেন রামন! যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানে উৎসুক, মেধায় তীক্ষ্ণ আলোক বিক্ষেপণ যা অন্যেরা অনুমান করতে পারেন নি তাঁর বুদ্ধির সামনে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবু শেক্সপিয়রের হ্যামলেট থেকে ভাষা ধার করে আমরা প্রশ্ন করতে পারি তিনিও কি আমাদের মত ধূলির দেহ ধারণ করেন নি? আমাদেরই মত উচ্চাশায় জর্জরিত হন নি? উচ্চকাঙ্খা সব সময়ই চেষ্টা করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মিটিয়ে ফেলতে।

তিনি কি ছিলেন এবং তাঁর পক্ষে কি হওয়া সম্ভব ছিল সবই রামন জানতেন। তাঁর পক্ষে যতদূর যাওয়া সম্ভব বিজ্ঞানের জগতে তিনি ততটাই গিয়েছিলেন। তাঁর ক্ষমতা ও সুযোগের শেষ বিন্দু অবধি উপভোগ করেছেন তিনি কখনো ক্ষান্ত দেন নি। 75 বছর বয়সে পিছন দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন,

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো আমি বৈজ্ঞানিক বিষয় ছাড়া অন্য দিকে মন দিয়েছি বলে স্মরণ হয় না।

প্রকৃতির রহস্যের বইটি তাঁকে অনন্তর আকৃষ্ট করত। মহাকাশের দুর্জ্ঞেও সঙ্গীত শোনার কান ছিল তাঁর। এই সঙ্গীত এখনো সব শোনা হয়নি—একবার এই কথা বলেন তিনি—তাই দীর্ঘদিন তাঁর বাঁচার আকাঙ্খা ছিল। তাঁর বেহালা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার শেষে শুস্টার রসিকতা করে বলেন তিনি মোটেই আনাড়ি বাজানদার নন। তিনি ছিলেন নতুন ধারনার জন্মদাতা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বা তাঁর সমকক্ষদের সঙ্গে আচরণে তিনি ছিলেন আমাদের অনেকেরই মত রূঢ়। প্রায়ই তিনি তাদের আঘাত করতে দ্বিধা করতেন না। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, হয়ত তা প্রশংসারই নামান্তর—যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে উচিত কথা বলা সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ থাকারই লক্ষণ। নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতেন তিনি, এমনকি সে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হলেও।

রামন ছিলেন নির্ভীক। রং এবং গঠনে সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন তিনি—আর প্রকৃতিকে ভালবাসা তো ছিলই। কয়েক হাজার ধরনের প্রজাপতি সংগ্রহ করেন তিনি। পরীক্ষার জন্য নানা আকারের ও উজ্জ্বলতার শত শত হীরা কেনেন। রামন ইনস্টিটিউটে তাঁর বাড়ীর চারিদিকে তিনি অরণ্য গড়ে তোলেন। তিনি বলতেন "একটা বিশেষ বয়সের পর হিন্দুদের বাণপ্রস্থ যাবার বিধান আছে। জঙ্গলে যাবার বদলে আমি জঙ্গলকেই আমার কাছে নিয়ে এসেছি।" মাউন্ট উইলসনের মানমন্দিরে যখন তিনি নিমন্ত্রিত হন তখন সেখানে খালি পায়ে হাঁটতেন। সঙ্গীত ভালবাসতেন তিনি; আলো, বর্ণ ও প্রকৃতির মত। নিজেই নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ ছিলেন রামন। আর. এস. কৃষ্ণান যিনি বারো বছরেরও বেশি সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন মন্তব্য করেন :

> নিজের জগতের বাইরের কোন ব্যাপার নিয়ে অধ্যাপক রামন মাথা ঘামাতেন না। বাইরের কিছু তাঁকে বিরক্ত করে এটাও তিনি পছন্দ করতেন না।

রামন মদ স্পর্শ করতেন না, নিরামিষ ভোজন করতেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। কিন্তু কোন আচার বিচার পালন করতেন না। একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, 'আমাদের এই প্রাচীন দেশের উপযুক্ত এক বিজ্ঞান চর্চাকেন্দ্র গড়ে তোলা আমার একান্ত ইচ্ছা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি প্রত্যেক দেশপ্রেমী প্রকৃত পথের সন্ধান পেয়ে সাহায্যের হাত বাড়ায় একমাত্র তাহলেই এটা সম্ভব হতে পারে।' এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রামন তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন, তবে বীজ রোপিত হয়—কিন্তু তা ফলপ্রসূ হবে কিনা তা একমাত্র সময়ই বলতে পারে। রামনের মৃত্যুর পর তাঁর গবেষণা গোষ্ঠী কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। রামন ইনস্টিটিউটের কাজকর্ম তাঁর মৃত্যুর পর এমন কিছু হয়নি যাকে উল্লেখযোগ্য বলা যায়। তবে টি. এস. এলিয়টের ভাষায় বিজ্ঞান সব সময়ই 'এক নতুন আরম্ভের সূচনা করছে, অব্যক্তকে জানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

রামন জীবনে সবচেয়ে চমৎকার যে দানটি পেয়েছিলেন তা তাঁর স্ত্রী লোকসুন্দরী। এত গুণবতী ও দয়াময়ী রমণী ছিলেন তিনি যে, রামনের ছাত্রেরা সকলেই তাঁর ভক্ত ছিলেন।[1] যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করেন ভারত কোন দিক দিয়ে পশ্চিমের দেশগুলির থেকে আলাদা আমি বলব মেয়েদের একনিষ্ঠতায়। এটাই ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরব। টেনিসন বলেছেন 'পুরুষ কর্ম ও খ্যাতির স্বপ্নের মধ্যে বাঁচে, নারী বাঁচে প্রেমে।' রামনের যশগৌরবের স্বপ্ন সফল হয়েছিল সম্ভবত তার একটি কারণ লোকসুন্দরী সর্বদাই ভালবাসা দিয়ে তাঁকে পুষ্ট করেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি অন্যমনস্ক স্বামীর খাবার নিয়ে অপেক্ষা করতেন, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কফি কতবার গরম করেছেন। তাঁর স্বামী যাতে ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন

---

[1] বইটি লেখার সময় অসুস্থ ছিলেন। যখন বইটি ছাপা হচ্ছে পরলোকগমন করেন।

এতেই ছিল তাঁর আনন্দ। সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য যে বোঝাপড়া দরকার হয় এ ছিল তার চেয়ে আলাদা। স্বামীর প্রয়োজনের সঙ্গে তিনি নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছিলেন। প্রয়োজন বা পূণ্যের খাতিরে নয়—এটা ছিল তাঁর ধর্ম। রামনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবার তাঁর অধিকার—এ অধিকার তিনি চেয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। এই যে একান্তভাবে নিজেকে উৎসর্গ করা এর মধ্যে ভারতীয় নারী তার চরিতার্থতা পায়। লোকসুন্দরীর কাছে এই নিষ্ঠাই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। রামন যখন পরম প্রশান্তির মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তিনি যে পরিপূর্ণ জীবন ফেলে গেলেন তার সবচেয়ে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ছিলেন লোকসুন্দরী।

রামন প্রভাব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক টীকা

রামন প্রভাব আলোকের বস্তু থেকে এক ধরনের বিক্ষেপণ। এর ভৌত ধর্ম জানতে হলে আলোকের ধর্ম জানতে হবে। আলো কি সে কথা পুরোপুরি সঠিক কারুর জানা নেই। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে যে আলোচনা করব তাও হবে আংশিক, আলোক বিষয়ে শেষ কথা নয়।

আলোর ধর্ম

তরঙ্গবাদ মতে দৃশ্য আলো পর্যাবৃত্ত তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র, এর কম্পাংকের পাল্লা প্রতি সেকেণ্ডে 4×10^{14} থেকে 8×10^{18} বার, বায়ুশূন্য স্থানে (ভ্যাকুয়মে) এর গতিবেগ ধ্রুবক—প্রতি সেকেণ্ডে 3×10^{10} সেমি। তরঙ্গ গঠনকারী তড়িৎ ও চুম্বকীয় ক্ষেত্র যে কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে। এই বর্ণনা অনুযায়ী আলো পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনশীল চলমান তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র ছাড়া কিছু নয়।

ফুরিয়ার প্রমাণ করেন কোন পর্যাবৃত্ত রাশি (অর্থাৎ যা সময়ের সঙ্গে আবর্তনশীল) মানান সই বিস্তার (E_1, E_2, E_3............) সহ পূর্ণ কম্পাংক ν এর গুণিতক (ν, 2ν, 3ν.........) কম্পাংকের সাইন (অথবা কোসাইন) ফলনের শ্রেণীর সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ও নির্দিষ্ট সময়ে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তী তড়িৎক্ষেত্র (E) নিম্নলিখিত উপায়ে প্রকাশ করা যায় :

$$E=E_0+E_1\sin 2\pi\nu t+E_2\sin 2\pi(2\nu t)+E_3\sin 2\pi(3\nu)t+\ldots\ldots$$

প্রত্যেকটি সাইন ফলনের গাণিতিক ধর্ম এক। তাই বিচারও উপলব্ধির জন্য একটি সামঞ্জস্য ফলনের আলোচনা করা যাক।

$$E=E_1\sin 2\pi\nu t$$

উপরের সমীকরণ অনুযায়ী তড়িতের অনেক সাইন তরঙ্গ হতে পারে যাদের কম্পাংক এক কিন্তু 'দশা' ভিন্ন। দুটি তড়িৎ তরঙ্গের দশার পার্থক্য হয় ϕ কোণ যখন তাদের তীব্রতার চরম $\phi/2\pi\nu$ সময় ব্যবধানে থাকে। প্রতি সেকেণ্ড ν সাইক্‌ল কম্পাংককে প্রতি সেকেণ্ডে রেডিয়ান এককে কৌণিক বেগে (ω) পরিবর্তিত করা সমীকরণ হল $\omega=2\pi\nu$। সহজে প্রকাশ করার এটা একটা গাণিতিক ধারণা—এর ফলে সমীকরণটি দাঁড়ায় $E=E_1\sin\omega t$। সমীকরণ অনুযায়ী x অক্ষ বরাবর চলমান একটি সামঞ্জস্য তরঙ্গ যে কোন (t) সময়ে, যে কোন (x) বিন্দুতে অবস্থান প্রকাশ করা যাবে।

$E=E_1\sin 2\pi\nu(t-x/c)x\leq ct.$ কারণ আলোর গতিবেগ অতিক্রম করা যায় না।

তড়িৎ তরঙ্গের বিস্তার, যা তীব্রতা নির্ণয় করে, সময় $t=0$ এবং $x=0$ হলে, শূন্য হবে।

তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণে চুম্বকীয় অংশ তাড়িত অংশের সমদশায় থাকে এবং নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় :

$$H=H_1\sin 2\pi\nu(t-x/c)$$

তরঙ্গের গতিবেগ (c), তরঙ্গদৈর্ঘ্য(λ) এবং কম্পাংক (ν) এদের মধ্যে সম্পর্ক হল

$$c=\lambda\nu$$

এই সম্পর্ক অতি সহজেই পাওয়া তরঙ্গের দৈর্ঘ্য (λ) সঙ্গে প্রতি সেকেণ্ডে কতবার (v) গুণ করলেই প্রতি সেকেণ্ডে গতিবেগ।

আলোর উপাদান তড়িৎ ও চুম্বক তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পাল্লা 3800 থেকে 7600 Å (অ্যাংস্ট্রম একক-সংকেত $A=10^{-8}$ সেমি) এবং সেই অনুযায়ী কম্পাংকের পাল্লা আগেই বলা হয়েছে।

তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গগুলি অনুপ্রস্থ বলা হয়ে থাকে। এর সব থেকে ভাল উদাহরণ একটি বাঁধা দড়ি খোলা প্রান্ত ওপর নিচে নাড়ালে যে ঢেউ ওঠে তার মত, অবশ্য উদাহরণটি সঠিক নয়। তার প্রথম কারণ তড়িচ্চুম্বকীয় আলোর বিকিরণে দুটি অংশ থাকে তড়িৎক্ষেত্র (E) এবং চুম্বকক্ষেত্র (H) একে ওপরের সমকোণ ও সমদশায় এবং তড়িৎক্ষেত্র ও চুম্বকক্ষেত্র দুটির সমকোণ বরাবর এর বিস্তারণ হয়। দক্ষিণাবর্তী সূত্র দিয়ে বিস্তারণ বর্ণনা করা যায়। আলোর গতিপথের যে কোন বিন্দুতে বুড়ো আঙুল, তর্জনী ও মধ্যমাকে প্রত্যেকে অন্যটির সমকোণ ধরলে যদি বুড়ো আঙুল তড়িৎক্ষেত্রের দিক হয় ও তর্জনী চুম্বকক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করে তবে মধ্যমা বিস্তারণের দিক সূচীত করবে। দ্বিতীয় কারণ হল কম্পনরত দড়িতে যেমন হয় তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গে তেমনভাবে বক্ররেখার মত অনুপ্রস্থভাবে এর বিস্তার ছড়িয়ে পড়ে না। E ও H ক্ষেত্রের তীব্রতা দূরত্ব(x) এবং সময়(t) অনুযায়ী বিস্তারণ রেখা বরাবর সুসামঞ্জস্যভাবে বিস্তারিত হয়। এই ক্ষেত্রগুলি স্কেলার নয় ভেক্টর রাশি এবং যে কোন বিন্দুতে মাত্রা ছাড়াও এদের একটি বিশেষ দিক থাকে। গাণিতিক ভাবে তাই তড়িৎ বা চুম্বক 'তরঙ্গ' সাইন তরঙ্গ দিয়ে প্রকাশ করা যায়। ক্ষেত্রীয় তীব্রতার-দিক সম্বলিত হলে ঐ সাইন তরঙ্গের বিস্তারে x অক্ষে নির্দিষ্ট বিন্দুতে ক্ষেত্রীয় তীব্রতার মাত্রা এবং দিক দুই নির্দেশ করে (অর্থাৎ ঐ বিন্দুতে অবস্থিত একটি তড়িৎ অথবা চুম্বক মেরুর উপর যথাক্রমে তড়িৎক্ষেত্র বা চৌম্বকক্ষেত্র যে বল সৃষ্টি করবে তার মাত্রা এবং দিক নির্দেশ করে)। সাধারণত অবিচ্ছিন্ন বিস্তারণের দিক বরাবর তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র বদলাতে পারে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'তরঙ্গাগ্র' নামক তলে তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রে দশা এক থাকে।

যে কোন একটি দিকে বিস্তারণরত তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের তড়িৎ বা চুম্বক অংশ উল্লেখিত চিত্র : 1- এর সাহয্যে প্রকাশ করা যায় :
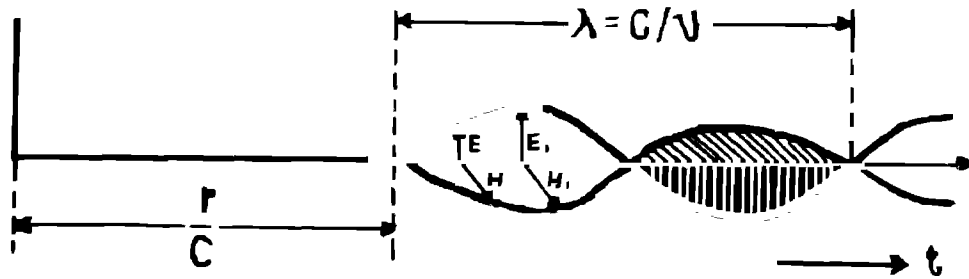
চিত্র 1 · সাইন-তরঙ্গ অনুযায়ী কম্পমান ইলেকট্রন থেকে r দূরত্বে t সময়ের সঙ্গে পরিবর্তী তড়িৎ ও চুম্বকক্ষেত্র।
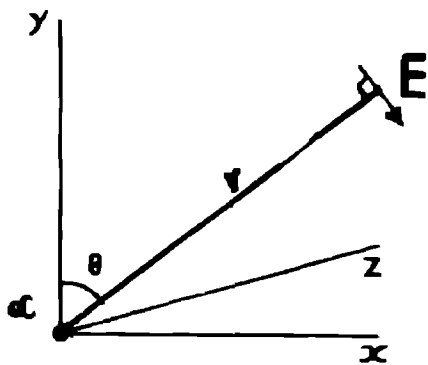
চিত্র 2 : একটি ইলেকট্রন থেকে r দূরত্বে তড়িৎক্ষেত্র—ইলেকট্রনের পরিবর্তী ত্বরণ α এবং বিস্তার r অপেক্ষা অনেকঅনেক কম।

উত্তেজক বা চালক বলের প্রভাবে যখন একটি ইলেকট্রন কাঁপে—ধরা যাক সামঞ্জস্য গতিতে যার কম্পাংক v এবং বিস্তার α যেমন 2 নং চিত্রে দেখান আছে, তখন তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রন y অক্ষ

বরাবর কাঁপলে বিকিরণ কোন দিকে বিস্তারিত হবে তাও 2 নং চিত্রে দেখান হয়েছে। কম্পমান ইলেকট্রনের চার্জ যদি e হয় এবং ত্বরণ $\alpha = a \sin 2\pi\nu t$, তবে t সময়ে তার ক্ষেত্রীয় বল

$$E = ea/4\pi c^2 r \ \sin\theta \sin 2\pi\nu\,(t - r/c)$$

θ হচ্ছে y অক্ষের সঙ্গে r দিকের কোণ। বিস্তার a এর মাত্রা r এর তুলনায় অনেক কম।

চালক বলের থেকে পাওয়া শক্তি তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। যে কোন মুহূর্তে d Ω ঘনকোণে বিকিরিত ক্ষমতা নির্ভর করে আধান (e) এবং তার ত্বরণের (বিস্তার a) উপর এবং লেখা যায়

$$dI = e^2 a^2 / 4\pi c^2 \sin^2\theta\, d\Omega$$

সবদিক মিলিয়ে ধরলে বিকিরিত ক্ষমতা হবে $2/3/c^2 a^2/c^2$

তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের কম্পমান উৎসারক (যেমন ইলেকট্রন) বিকিরণের কম্পাংক নির্দিষ্ট করে বটে কিন্তু বিস্তারণের গতিবেগ একই থাকে। গতিবেগ কেন এক থাকে সে কথা পুরোপুরি জানা নেই। হতে পারে যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর থেকে উদ্ভূত মহাকর্ষ প্রভাবের জন্য এটা হচ্ছে, যে কোন অবস্থাতেই মহাকর্ষ প্রভাব ধ্রুব অর্থাৎ এক থাকে।

তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের দুই উপাংশে, তড়িতে ও চুম্বকে সমান শক্তি থাকে। ব্রিটিশ পদার্থবিদ জে. এইচ. পয়েন্টিং তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গে কতটা শক্তি থাকতে পারে হিসেব করেছিলেন

$c/4\pi = E.H$ প্রতি বর্গ সেমিতে প্রতি সেকেণ্ডে।

এই প্রসঙ্গে বলা চলে আমাদের গায়ে আলো পড়লে আমরা কোন তড়িৎ প্রভাব বুঝতে পারি না*, কারণ কোন বোধ সৃষ্টি করবার পক্ষে তড়িৎক্ষেত্র অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু আবার এই তড়িৎক্ষেত্রই চোখের দণ্ড ও শংকু আকার নার্ভপ্রান্তের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার দৃষ্টি দেয়।

তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ ও বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া

আলোর তড়িৎ ও চুম্বক ক্ষেত্রে শক্তি সমান হলেও আলো ও বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়ার চুম্বক ক্ষেত্রের ভূমিকা সাধারণত খুবই নগন্য। নিঃসন্দেহে বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রনের মত আহিত কণাদের তড়িৎ ও চুম্বক ধর্ম থাকে এবং তিন ধরনের পারস্পরিক ক্রিয়া হতে পারে যেমন তড়িৎ-তড়িৎ, তড়িৎ-চুম্বক এবং চুম্বক–চুম্বক, কিন্তু শেষের দুটি নগন্য। তড়িচ্চুম্বকীয় ও তড়িৎ-তড়িৎ পারস্পরিক ক্রিয়ার মান অত্যন্ত অল্প কারণ ঐ সংক্রান্ত বলগুলিও ক্ষীণমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে E এর H ক্ষেত্রে v গতিবেগে ধাবমান e আধান সমন্বিত একটি ইলেকট্রনের উপর মোট বল, দশকের আপেক্ষিকে।

$$F = -e \quad (E + v/c\, H)$$

গতিবেগ v যখন আলোর গতিবেগ c- র কাছাকছি হয় কেবলমাত্র তখনই চুম্বকক্ষেত্র বলের উপাংশ $ev/c\, H$ গুরুত্বপূর্ণ হয়। আবার অণু ও পরমাণুদের চুম্বকক্ষেত্র অত্যন্ত ক্ষীণ এবং আলোক তরঙ্গের চুম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার যে বলের উৎপাদিত হয় তার মাত্রা তড়িৎ-তড়িৎ পারস্পরিক ক্রিয়াজনিত বলের (eE) তুলনায় নগন্য।

সুতরাং আমরা কেবল তড়িৎ উপাংশ $E_1 \sin 2\pi\nu t$ বিষয়েই আলোচনা করব।

---

* সূর্যের আলোয় E- র সর্বোচ্চ তীব্রতা সি জি এস ইলেকট্রোস্টাটিক এককে 0.33 (=9.9 ভোল্ট সেমি) এর H- এর ক্ষেত্রে সি জি এস ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এককে 0.033 (জে. জীনস–দি ম্যাথমেটিকাল থিওরি অফ ইলেকট্রিসিটি এণ্ড ম্যাগনেটিজম, পৃ 538)।

আলোর ধ্রুবণ*

ইলেকট্রন প্রভৃতি নিঃসারণকারীর কম্পন কখনও নির্দিষ্ট দিক বরাবর হয় না তাই আলোক তরঙ্গের তড়িৎ ভেক্টরের দিকও সব সময় একই দিকে থাকে না। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ইলেকট্রন থেকে নিঃসৃত কম্পাংক ও তীব্রতার মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রতিটি ইলেকট্রন থেকে নিঃসারণের শুরু অনুযায়ী দশাও সাধারণত ভিন্ন হয়।

একটি অস্থির ইলেকট্রন থেকে আলো বেরুতে সময় লাগে 10^{-8} সে এবং 500 Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যর 10^{6} টি তরঙ্গ বের হতে পারে। কিছুক্ষণ পর পর যে তরঙ্গ স্রোত নিঃসৃত হয় তারা একই দিকে বিস্তৃত নাও হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট ইলেকট্রন, অবশ্য নির্দিষ্ট তড়িৎ ভেক্টর সমন্বিত তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ তরঙ্গ কিছুক্ষণ ধরে পাঠাতে পারে।

চুম্বকক্ষেত্রের দিক যে তলে থাকে তাকেই 'ধ্রুবণ-তল' বলা হয়।* সাধারণত ধ্রুবণ তল পরিবর্তিত হতে থাকে।

y-z তলে তড়িৎ ভেক্টর E কে দুই উপাংশে বিভক্ত করা যায় y অক্ষ ও z অক্ষ বরাবর। যদি দুই উপাংশের পরিবর্তন এমন হয় যে তড়িৎ ভেক্টরের অগ্রভাগ উপবৃত্তাকার সিলিণ্ডারে উপর হেলিক্স (পেঁচালো) আকার চিত্রিত করে (প্যাঁচের থাক তরঙ্গদৈর্ঘ্যর সমান) তবে তাকে উপবৃত্তীয় ধ্রুবণ বলে। প্রকৃত অবস্থার গাণিতিক মডেল অনুযায়ী এটি একটি ধারণা।

আগেকার ব্যাখ্যা মত তড়িৎ ভেক্টর বিস্তারণের দিক, ধরা যাক X দিক, থেকে সমকোণ বরাবর থাকে কিন্তু চারদিকে ছড়িয়ে পড়েনা। এই ভেক্টর বলের মাত্রা ও দিক নির্দিষ্ট করে কিন্তু এর ভৌতিক প্রসারণ হয় না। অবশ্য অবিচ্ছিন্ন আলোর রশ্মির পথে ভিন্ন মাত্রা ও ভিন্ন দিক সম্বলিত অবিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রও থাকবে।

যদি তড়িৎ ভেক্টরের অগ্রভাগ বৃত্তাকার সিলিণ্ডারের উপরিতলে পেঁচানো রেখা পাত করলে ঐ আলোকে বৃত্ত ধ্রুবিত বলা হয়। বলাই হয়েছে ধ্রুবণ কেমন হবে নির্ভর করে নিঃসরণকারী কণাগুলির গতির উপর।

বিপরীতমুখী (অর্থাৎ দক্ষিণাবর্তী ও বামাবর্তী) আলোক ভেক্টরের দুটি বৃত্ত ধ্রুবিত তরঙ্গ, যাদের মাত্রা সমান ও কম্পাংক এক এবং যাদের দশার মধ্যে $\pi/2$ ($90°$) তফাৎ, রেখা-ধ্রুবণ সৃষ্টি করে। তখন লব্ধ তড়িৎ ভেক্টর সব সময় একটি নির্দিষ্ট দিকে থাকে।

দেখা যাচ্ছে আসল প্রয়োজন হল বৃত্ত-ধ্রুবিত তরঙ্গের, যার দুটি অবস্থা : তড়িৎ ভেক্টর হয় দক্ষিণাবর্তী নয় বামাবর্তী। বৃত্ত-ধ্রুবণের এই দুই অবস্থা থেকে অন্য যে কোন অবস্থার ধ্রুবণ পাওয়া সম্ভব। যেহেতু আমরা একটি অক্ষ (X) বরাবর বিস্তারণ আলোচনা করছি (সমকোণ) তড়িৎ ভেক্টরের ঘোরার দিক মাত্র দুটোই হতে পারে, দক্ষিণাবর্তী বা বামাবর্তী। অন্য কোন দিক বাস্তবিক পক্ষে হতে পারে না।

তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের তড়িৎ ভেক্টর ক্ষেত্র পরীক্ষা করে মাপা যায়। কিন্তু তরঙ্গবাদ নিজের থেকে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। যেমন কোটরীয় (ক্যাভিটি) বিকিরণ বিভিন্ন কম্পাংকের শক্তি কার কত হবে বা আলোক বৈদ্যুত প্রভাব কেন হয় ইত্যাদি। আবার এক কিলোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ফোটনের কথা ভাবা যায় কি।

আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব

এর পরে আমরা এসে পড়ছি আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্বে যাতে আলোর সংজ্ঞা হ'ল $h\nu$ শক্তি এবং $h\nu/c$ ভরবেগ সম্পন্ন ফোটনের সমষ্টি, h প্লাংক ধ্রুবক। h এর ঘাত কৌণিক ভরবেগের সমান অথবা শক্তিকে x

---

* আলোর ধর্ম সঠিকভাবে জানার আগে থেকেই ধ্রুবণ আবিষ্কারের পর এই সংজ্ঞা চলে আসেছে।

সময় বা ভরবেগ x দূরত্বর সমান। দুইটি ধ্রুবণ অবস্থা অনুযায়ী বা তড়িৎ ভেক্টরের দুই দিকে ঘূন'নের অবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেকটি ফোটনে $h/2\pi$ একক সমান স্পিন কৌণিক ভরবেগ থাকে। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে স্পিনের মান এর অর্ধেক। অতএব আলোর ধ্রুবণ অবস্থা অনুযায়ী স্পিন হবে $+h/2\pi$ অথবা $-h/2\pi$ । বিস্তারণ দিকের অনুযায়ী আর কোনদিকে স্পিন থাকতে পারে না। একটি আবদ্ধ বর্গে (ক্লোজড সিস্টেম) যেহেতু মোট স্পিন নিত্য তাই আমাদের ধরে নিতে হবে যে কম্পমান ইলেকট্রন থেকে বিপরীতমুখী ফোটনের জোড়া তৈরি হবে। কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অনুসারে যে কোন শক্তির ফোটনের স্পিন এক।

দেশ এবং কালে ফোটনকে নির্দিষ্ট করা যায় না। (রামন এমত বিশ্বাস করতেন না)। সত্যি কথা বলতে কি ফোটনদের কখনও "দেখা" যায় না, কেবল যখন কোন বস্তুর সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া করে তখনই এর উপস্থিতি জানা যায়, যেমন ফটোগ্রাফিক অবদ্রবে বা অক্ষি-পটে।

বস্তু মাধ্যমের ধ্রুবণ

তড়িৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার শুধু আলো নয় বস্তু মাধ্যমের ধ্রুবণ অবস্থা বা দিশাত্মক ধর্ম থাকতে পারে। পরমাণু ও অণুর মধ্যে পজিটিভ ও নেগেটিভ আধান পৃথক পৃথক ভাবে থাকে। ইলেকট্রনের ও প্রোটনের আধানের মাত্রা সমান, নিউক্লিয়াস + টিভ এবং ইলেকট্রন − টিভ।

পরমাণু ও অণুর আয়তন প্রায় 10^{-8} সেমি সুতরাং আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যার মান 3.8×10^{-3} থেকে 7.6×10^{-4} সেমি তার থেকে অনেক ছোট। অর্থাৎ দৃশ্য আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অণু পরমাণুর আয়তনের থেকে কয়েক হাজার গুণ বড়ো। পজিটিভ আধানগুলি নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে যার আয়তন 10^{-12} সেমি।* নিউক্লিয়াসে চারদিকে যে সব ইলেকট্রনরা আছে তাদের আয়তন 2.8×10^{-13} সেমি। ইলেকট্রন বা নিউক্লিয়াসের আয়তনের তুলনায় ইলেকট্রনদের থেকে নিউক্লিয়াসের দূরত্ব অনেক গুণ বেশি। পরমাণুগুলি তাই তার মধ্যে বস্তু অল্প আর ফাঁক অনেক বেশি। টি. এস. ইলিয়টের অর্থহীন কথায় ভরা ফাঁকা মানুষের কথা মনে করিয়ে দেয়, যদি না তড়িৎক্ষেত্র, চুম্বকক্ষেত্র বা মহাকর্ষ ক্ষেত্রকেও অর্থহীন কথা মনে করা হয়।

গোটা পরমাণু বা অণুতে কোন আধান দেখা যায় না বটে কিন্তু ভেতরে পজিটিভ ও নেগেটিভ আধানদের কেন্দ্র সব সময় এক জায়গায় হয় না। এই দুই ধরনের আধানের মধ্যে দূরত্ব L 10^{-8} সেমি মত হয় এবং এই দূরত্বে আলোক বিকিরণের তড়িৎক্ষেত্রর তীব্রতা প্রায় $E_1 \sin 2\pi\nu t$ বলা যায়, তরঙ্গদৈর্ঘ্যর সামান্য পার্থক্য না ধরলেও চলে। বিপরীত আধান সম্পন্ন n সংখ্যক আধান (ne) l দূরত্বে থাকলে যে তড়িৎ দ্বিমেরু হয় তার মাত্রা nel ।

তড়িৎক্ষেত্র পজিটিভ ও নেগেটিভ আধানের সঙ্গে বা তড়িৎ দ্বিমেরুর সঙ্গে ক্রিয়ার যে বিপরীতমুখী বলের সৃষ্টি হয় তার ভ্রামক M । তড়িৎ ভেক্টর দূরত্ব l এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন দিকে আছে তার উপর নির্ভর করে।

ভ্রামক M ও তড়িৎক্ষেত্র E-র অনুপাতকে ধ্রুবণতা (α) বলা হয়, এটা অবশ্যই আলোচিত বিকিরক মাধ্যমের অণুদের ধর্ম।** ধ্রুবণ ও ধ্রুবণতা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভৌত অবস্থার কথা বোঝায়।

আলোর তড়িৎক্ষেত্র পরিবর্তী, চিহ্ন বদলায় বলে সেই অনুযায়ী দ্বিমেরু ভ্রামকের পরিবর্তনে পজিটিভ ও নেগেটিভ আধানের মধ্যে যে দোলনের সৃষ্টি করে—প্রযুক্ত আলোক ক্ষেত্রের কম্পাংকের উপর তা নির্ভর করে। যেহেতু ইলেকট্রনরা নিউক্লিয়াসের তুলনায় অনেক হাল্কা, তাই দোলনে তাদের অংশই বড়।

---

* নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ আনুমানিক $1.5\times10^{-13} A^{1/3}$ সেমি − A ভরসংখ্যা।

** অণুর ধ্রুবণতা (α) সাধারণত ত্রিমাত্রিক প্রতিসম টেনসর রাশি, যার উপাংশ α_{xx}, α_{yy}, α_{zz}, α_{xy}, α_{yz} এবং α_{zx}

তারপর আপতিত তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের তাড়নায় অণুপরমাণুর মধ্যে দোলায়মান ইলেকট্রনগুলি নিজেরাই আপতিত আলোর সমান কম্পাংকের বিকিরণ দিতে থাকে, ইলেকট্রনের নিজস্ব স্বাভাবিক কম্পাংক ও অবমনান (ড্যাম্পিং) উপেক্ষিত হয়। একে আলোর র‍্যালে বিক্ষেপণ বলে।

দোলায়মান ইলেকট্রনগুলি পজিটিভ ও নেগেটিভ আধানদের মধ্যে দূরত্বের পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং তার ফলে অণুগুলির ধ্রুবণতার (α) পরিবর্তন হয়। ধ্রুবণতা পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয় ক্ষীণতর গৌণ, বিকিরণদের—যাদের কম্পাংকগুলি ভিন্ন এবং অণুদের গঠন ও তড়িৎ ধর্মের বৈশিষ্ট্য সূচক।

পরিবর্তিত ধ্রুবণতা নিম্নলিখিত সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা যায় :

$$\alpha=\alpha_1+\alpha_2 \sin 2\pi\nu_0 t.$$

ν_0 অণুদের দোলনের বৈশিষ্ট্য সূচক একটি কম্পাংক। এটি প্রযুক্ত কম্পাংকের (ν) নিরপেক্ষ ও ভিন্ন।

পরিবর্তী আপতিত আলোর তড়িৎক্ষেত্র ($E=E_1 \sin 2\pi\nu t$) এবং অণুদের পরিবর্তী ধ্রুবণতার পারস্পরিক ক্রিয়ায় একটি পরিবর্তী তড়িতের দ্বিমেরু ভ্রামকের সৃষ্টি হয় :

$$M=\alpha E$$
$$=(\alpha_1+\alpha_0 \sin 2\pi\nu_0 t)(E_1 \sin 2\pi\nu t)$$
$$=E_1\alpha_1 \sin 2\pi\nu t+½ E_1\alpha_0 [\cos 2\pi (\nu-\nu_0) t-\cos 2\pi (\nu+\nu_0 t]$$

উপরের ডান দিকের শেষ ব্যঞ্জকের প্রথম অংশটি হল র‍্যালে বিক্ষেপনের জন্য এবং দ্বিতীয় অংশটি রামন বিক্ষেপনের–যার মধ্যে কম্পাংকের দুই উপাংশ $\nu-\nu_0$ এর $\nu+\nu_0$। প্রযুক্ত কম্পাংক ν থেকে একটি ছোট (বলা হয় স্টোকস) অন্যটি বড় (এ্যান্টি-স্টোকস) এবং দুটির পার্থক্য সমান ν_0।

কিন্তু এর মধ্যে একটা খুঁত থেকে গেছে। এই সমীকরণ অনুযায়ী রামন নিঃসরনের $\nu-\nu_0$ এবং $\nu+\nu_0$ এই দুটি কম্পাংকের তীব্রতা সমান হওয়ার কথা, কিন্তু আসলে তা পাওয়া যায় না। তীব্রতার সঠিক মাত্রা কেবল কোয়াণ্টাম তত্ত্ব থেকে পাওয়া যায় (পৃ. 31 দেখুন)।

আমরা কেবল অণুর চলন অর্থাৎ রেখিক দোলনের বিষয় আলোচনা করলাম। এ ছাড়া ঘূর্নী ধরনের জন্যও অনুরূপ প্রভাবের সৃষ্টি হয়।

অবশেষে ν কম্পাংকর আপাতিত বিকিরণের জন্য চারটি ভিন্ন ধরনের বিক্ষেপণের দরুণ কম্পাংকের পার্থক্য লিস্ট করা যাক।

(i)	র‍্যালে-টিণ্ডাল	:	$\nu_{R-T}=\nu$	র‍্যালে-টিণ্ডাল কম্পাংক ν_{R-T} এবং উত্তেজক কম্পাাংক ν সমান।
(ii)	প্রতিপ্রভা (স্টোকস)	:	$\nu_S<\nu$	ν_S প্রতিপ্রভ বস্তুর বৈশিষ্ট্য। বিক্ষিপ্ত বিকিরণের কম্পাংক কখনই উত্তেজক বিকিরণের কম্পাংকের (ν) বড় হয় না।
(iii)	কম্পটন	:	$\nu_C<\nu$	ν_C বিক্ষেপন কোণের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।
(iv)	রামন	:	$\nu_R \lesseqgtr \nu$	বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রেখা পাওয়া যায়। কিন্তু $\nu_R<\nu$ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পরমশূন্য তাপমাত্রায় $\nu_R<\nu$। কম্পাংকের পরিবর্তন বা সরণ বিক্ষেপন কোণের উপর নির্ভর করে না। রামন সরণ-বিক্ষেপক বস্তুর বৈশিষ্ট্য উত্তেজক আলোর নয় এবং বিক্ষিপ্ত আলোর

দশার সঙ্গে উত্তেজক আলোর দশার কোন সম্পর্ক থাকে না।

বাইরে থেকে আসা বিকিরণের প্রভাব অবিচল অণুর শক্তিস্তর m থেকে শক্তি শোষণের পর n স্তরে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত নেমে আসে l এ। স্টোক এবং অ্যান্টি স্টোক রেখাদের অনুপাত হয় $e^{-h\nu/kT}$। k বোলট্জম্যান ধ্রুবক এবং T পরম এককে বিক্ষেপকের তাপমাত্রা।

সূত্র

1. 'দি ফাইম্যান লেকচার অন ফিজিক্স', এডিসন-ওয়েসলে পাবিলিশিং কোং, I খণ্ড (অধ্যায় 28, 31 ও 32); II খণ্ড (অধ্যায় 31, 32); III খণ্ড (অধ্যায় 11)।
2. এ. এস. কোম্পানে ইয়েটস, 'থিওরেটিকাল ফিজিক্স", ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস, মস্কো, 1969, পৃ 167-68।
3. আর. ডব্লু. ডিচবার্ণ, "লাইট", ব্লাকি এণ্ড সন 1952।
4. ডব্লু. এ. সুরক্লিফ এবং এস. এস. বালার্ড, "পোলারাইজড লাইট", ভ্যান নস্টার্ড রাইনহোল্ড মোমেণ্টাম বুক, 1954।
5. জি. হার্টজবার্গ, "মলিকুলার স্পেক্ট্রা এণ্ড মলিকুলার স্ট্রাকচার, ইনফ্রারেড এণ্ড রামন স্পেক্ট্রা অফ পলিএটমিক মলিকিউলস", ভ্যান লস্টার্ড কোং, 1964, পৃ 239-71।
6. এল. ল্যাণ্ডার্ড এণ্ড ই. লিফস্টিজ, "দি ক্লাসিকাল থিওরি অফ ফিল্ডস", পারগামন প্রেস, 1951, পৃ 232।
7. বি. জি. সেভিচ, "থিওরেটিকাল ফিজিক্স", নর্থ হল্যাণ্ড পাবলিশিং কোং, 1970, পৃ 117-157।

'নতুন বিকিরণ' বিষয়ে নেচারে পাঠান চিঠিপত্র

নেচার, মার্চ 31, 1928 খণ্ড 121, পৃ 501

একটি নতুন গৌণ বিকিরণ

যদি আমরা ধরে নিই যে অধ্যাপক কম্পটন বর্ণিত এক্সরে বিক্ষেপণে 'অপরিবর্তিত' বিকিরণ অণু ও পরমাণুদের সাধারণ বা গড় অবস্থার সূচক এবং ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যর 'পরিবর্তিত' বিক্ষেপণ তাদের অবস্থার হ্রাস-বৃদ্ধির সূচনা করে, তবে এই যুক্তিতে আমরা একথাও বলতে পারি যে সাধারণ আলোর ক্ষেত্রেও বিক্ষেপণে দুটি ধরন থাকবে—একটি অণু পরমাণুদের আলোকীয় ধর্মের জন্য, অন্যটি তাদের সাধারণ অবস্থার হ্রাসবৃদ্ধির জন্য। সুতরাং প্রকৃতিতে এটা ঘটে কিনা জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের গবেষণায় এই অনুমান সত্য বলে প্রামাণ করা গেছে। ধুলি-বিহীন তরল ও গ্যাসের অণু, পরমাণু থেকে বিক্ষেপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিচ্ছুরিত বিকিরণে আপতিত রশ্মির সমান তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলো ত আছেই, কিন্তু তার সঙ্গে কম কম্পাংকের পরিবর্তিত বিকিরণও রয়েছে।

আমাদের আবিষ্কৃত এই নতুন আলোর বিক্ষেপণ দেখার জন্য স্বভাবতই অত্যন্ত জোরালো আলো লাগে। আমাদের পরীক্ষাগুলিতে সূর্যের রশ্মি কেন্দ্রীভূত করতে ব্যবহার করা হয়েছে 18 সেমি উন্মেষ (অ্যাপারচার) ও 230 সেমি ফোকস দূরত্ব সম্পন্ন দূরবীক্ষণের অভিলক্ষ্য (অবজেকটিভ) এবং তার সঙ্গে 5 সেমি ফোকস দূরত্বের আর একটি লেন্স। বিক্ষেপক বস্তু হিসেবে বারংবার পাতনে শুদ্ধ তরল বা তার বাষ্প ব্যবহার করা হয়েছে দ্বিতীয় লেন্সের ফোকসে। পরিবর্তিত বিক্ষেপণ দেখার জন্য অনুপূরক আলোক ফিল্টার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। একটি নীল-বেগুনি ফিল্টারের সঙ্গে একটি হলদে-সবুজ ফিল্টার একত্রে আপতিত, আলোয় ধরলে ঐ তরল বা গ্যাস থেকে নির্গত আলো সম্পূর্ণ লোপ পায়। এর পর হলদে ফিল্টারটি তুলে এনে বিক্ষেপক ও পরীক্ষকের চোখের মাঝখানে ধরলে আলোর রেখা ফিরে আসে ও পরিবর্তিত বিক্ষিপ্ত বিকিরণের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। বর্ণালি বীক্ষণযন্ত্রেও এর প্রমাণ পাওয়া গেছে।

60 টি ভিন্ন ভিন্ন তরলে এই পরীক্ষা করা হয় এবং প্রত্যেকটিতে এই প্রভাব কম বা বেশি মাত্রায় দেখা গেছে। এই প্রভাব যে সত্যই বিক্ষেপণ, প্রতিপ্রভা নয়, তার কারণ প্রথমত স্বাভাবিক বিক্ষিপ্ত আলোর তুলনায় এগুলি অতি ক্ষীণ এবং দ্বিতীয়ত এগুলি ধ্রুবিত, এর ধ্রুবণ অনেক ক্ষেত্রেই অতি তীব্র এবং সাধারণ বিক্ষেপণের ধ্রুবণের সঙ্গে তুলনীয়। গ্যাস বা বাষ্প নিয়ে এই পরীক্ষা চালানো বেশ কঠিন কারণ সে ক্ষেত্রে প্রভাবটি আরও ক্ষীণ হয়ে পড়ে। তা সত্বেও বাষ্পের ঘনত্ব যথেষ্ট হলে, যেমন ইথার বা এমিলিনে, পরিবর্তিত বিক্ষেপণ সহজেই দেখানো যায়।

210 বৌবাজার স্ট্রীট
কলকাতা, ভারতবর্ষ, ফেব্রুয়ারী 16

সি. ভি. রামন
কে. এস. কৃষ্ণান

নেচার, এপ্রিল 21, 1928 ; খণ্ড 121, পৃ 619

আলোর বিক্ষেপণে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন

আমাদের আবিষ্কৃত নতুন ধরনের আলোক বিক্ষেপণ বিষয়ে কৃষ্ণান ও আমি আরও যে পরীক্ষা করেছি তার ফলাফল অত্যন্ত বিস্ময়কর ও কৌতূহল উদ্দীপক।

আমাদের দেখা গৌণ বিকিরণ যে সত্যকার আলোক বিক্ষেপণ, প্রতিপ্রভা নয়, এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে এই প্রভাব নিয়ে বিষদভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। গ্যাসে ও বাষ্পে এই প্রভাব দেখতে পাওয়ার প্রধান অন্তরায় হল এর অত্যধিক ক্ষীণতা। যে সব বস্তুর আলো বিক্ষেপণ-ক্ষমতা বেশি তাদের বেলায় এই বাধা অতিক্রম করা গেছে বন্ধ বালবে রেখে গরম করে, যতক্ষণ না বাষ্পের ঘনত্ব যথেষ্ট হচ্ছে। আপতিত আলোর পথে একটি নীল-বেগুনী ফিল্টার এবং পর্যবেক্ষকের চোখের সামনে পরিপূরক সবুজ-হলদে ফিল্টার রেখে অনেকগুলি জৈব যৌগের বাষ্পে পরিবর্তিত বিক্ষিপ্ত বিকিরণ দেখা গেছে এবং তাদের ধ্রুবণ অবস্থা মাপাও সম্ভব হয়েছে। পেন্টেন প্রভৃতি কয়েকটি নমুনার ধ্রুবণ অতি তীব্র আবার নাপথালিন প্রভৃতি অন্য অনেক নমুনার ধ্রুবণ অতি ক্ষীণ এবং তরল অবস্থায় দেখা ধর্মের সদৃশ। স্টীলের পর্যবেক্ষণ পাত্রে তরল কার্বণ-ডাইঅক্সাইড রেখে পরীক্ষা করা হয় এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পরিবর্তিত বিক্ষেপণ দেখা যায়। পাত্রের মধ্যে প্রসারণের ফলে যখনই মেঘ জমে ঠিক একই সময়ে পরিবর্তিত বিক্ষেপণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সাধারণ বা সনাতনী বিক্ষেপণের মত। অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে সন্নিহিত অণুদের থেকে পবিরর্তিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণগুলি নিজেদের মধ্যে সুসম্বদ্ধ।

বর্ণালিবীক্ষণের পরীক্ষায় আরো বড় চমক পাওয়া গেল। প্রদীপক হিসেবে নীল ফিল্টার দেওয়া সূর্যের আলো ব্যবহার করে বর্ণালিতে বিক্ষিপ্ত আলোর উপস্থিতি দেখা গেল যেগুলি আপতিত আলায় নেই। আপতিত আলোয় উপযুক্ত ফিলটার বসিয়ে বর্ণালির দুটি ভিন্ন অংশ সনাতনী বিক্ষেপণ ও পরিবর্তিত বিক্ষেপণ দেখা গেল তাদের মাঝে একটি অন্ধকার অংশ দিয়ে আলাদা করা। এতে উৎসাহিত হয়ে আমরা উৎস হিসেবে মার্কারি আর্ক ব্যবহার করি এর ফিলটারের সাহায্যে 4358 Å এর বড় সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যর বিকিরণ বাদ দেওয়া হয়। বর্ণালিবীক্ষণে বিক্ষিপ্ত বিকিরণ পরীক্ষা করলে দেখা যায় আপতিত আলোর জন্য উজ্জ্বল রেখা ছাড়া আরও কতকগুলি তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রেখা আছে যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য 4358 Å চেয়ে বড়; এদের মধ্যে অন্তত দুটি রেখা লক্ষণীয়, তাদের সঙ্গে আরও কতকগুলি ক্ষীণ রেখাও আছে এবং আর আছে অবিচ্ছিন্ন বর্ণালি। বর্ণালির ফটোগ্রাফ তুলে মাপজোক করে দেখা হচ্ছে এই নতুন দুটো রেখার কম্পাংকের সঙ্গে আপতিত আলোর কম্পাংকের সম্পর্ক কি। চোখে দেখে প্রাথমিক পরীক্ষায় মনে হচ্ছে পরিবর্তিত মূল রেখাগুলির অবস্থান সব বস্তুর ক্ষেত্রে এক, যদিও তাদের তীব্রতা এবং অবিচ্ছিন্ন বর্ণালির তীব্রতা বস্তুগুলির রাসায়নিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

210 বৌবাজার স্ট্রীট
কলকাতা, মার্চ 8

সি. ভি. রামন

নেচার, মে 5, 1928. খণ্ড 121. পৃ 711

কম্পটন প্রভাবের আলোকীয় প্রতিরূপ

তরল ও বায়বীয় বস্তু থেকে বিক্ষেপণের সময় আপতিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর উপস্থিতি খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে সঙ্গের ফটোগ্রাফ থেকে (1 নং ছবিতে)।* কোয়াজ মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের আলো থেকে গাঢ় নীল রঙের থেকে বড় সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ফিলটার করার পর আলোর বর্ণালি দেখান হয়েছে। বর্ণালি চিত্রে 4358 Å রেখাটিকে D এবং 4047, 4078, এবং 4109 Å রেখাগুলিতে c বলা হয়েছে। 2 নং বর্ণালি চিত্রে টলুইন থেকে বিক্ষিপ্ত আলোর বর্ণালি দেখা যাচ্ছে। দেখা যাবে যে আপতিত আলোর বর্ণালিতে যে রেখাগুলি আছে সেগুলি ছাড়াও বিক্ষিপ্ত আলোর বর্ণালিতে আরও কতকগুলি রেখা আছে। ছবিতে এগুলিকে a, b, c দাগ দেওয়া হয়েছে এবং এছাড়া ফটোগ্রাফের বাইরে দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আরও একসারি রেখা চোখে দেখা গেছে। একটি যথাযোগ্য ফিলটারের সাহয্যে আপতিত আলোর থেকে 4358 রেখাটি কেটে দিলে, অন্য রেখাগুলিও অদৃশ্য হয়, তাতে বোঝা যায় এগুলির উৎপত্তি আপতিত আলোর 4358 রেখার জন্য। একই ভাবে যদি আপতিত বিকিরণের সামনে কুইনিন দ্রবণ দিয়ে ফিল্টার করলে 4047, 4078, 4109 রেখাগুলি কেটে দিলে 2 নং বর্ণালিতে c রেখাটি অদৃশ্য হয় কিন্তু 4358 Å রেখাজনিত রেখাগুলি দেখা যেতে থাকে। সুতরাং কম্পটন প্রভাবের প্রতিরূপ অবস্থা পরিষ্কার বোঝা যায়, তবে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কারণ এখানে যা হয় তা এক্সরের থেকে অনেক বেশি।

আলোক বিক্ষেপণে নতুন বিশেষ রেখাগুলির সাময়িক ব্যাখ্যা হিসেবে ধরা যেতে পারে যে আপতিত বিকিরণের কোয়ান্টাম তরলের মধ্যে সমস্ত অণুদের সঙ্গে বা তার একাংশের থেকে বিক্ষিপ্ত হতে পারে; প্রথম ক্ষেত্রে মূল তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বর্দ্ধিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে। কম্পাংক হ্রাসের মান দেখা যায় অণুতে অবলোহিত শোষণ রেখার কম্পাংকের কাছাকাছি এটাও এই ব্যাখ্যার সমর্থন করে। তাছাড়া দেখা গেছে যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সরণ সব অণুর ক্ষেত্রে এক নয়—এও ব্যাখ্যার সমর্থনে যায়।

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যেৰ সযত্ন পরিমাপ করা হচ্ছে এবং শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান করা যাবে।

210 বৌবাজার স্ট্রীট
কলকাতা, মার্চ 22

সি. ভি. রামন
কে. এস. কৃষ্ণণন

---

* ছবিগুলি এই বইতে ছাপা হয়নি।

পরিশিষ্ট III

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যানের বক্তৃতা ও সি. ভি. রামনের নোবেল বক্তৃতা

স্টকহোম, 11 ডিসেম্বর 1930

রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসের নোবেল কমিটি ফর ফিজিক্সের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এইচ. প্লিজেলের বক্তৃতা

ইয়োর ম্যাজেস্টি, ইয়োর রয়্যাল হাইনেস,

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে 1931 সালের পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে স্যার ভেঙ্কট রামনকে আলোর বিক্ষেপণে তাঁর কাজ এবং তাঁর নামাঙ্কিত প্রভাব আবিষ্কারের জন্য।

আলোর ব্যাপন যে একটি আলোকীয় ঘটনা তা বহুদিন ধরে সকলের জানা। আলোর রশ্মি চোখে সোজাসুজি না পড়লে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু যদি একগুচ্ছ রশ্মি সূক্ষ্ম ধূলিপূর্ণ মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যায় আলোর রশ্মি পাশের দিকে বিক্ষিপ্ত হয় এবং মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে রশ্মির গতিপথ পাশ থেকে চোখে দেখা যায়। ঘটনাক্রমটি এইভাবে বর্ণনা করা যায়—ছোট ছোট ধূলিকণা আলোক রশ্মির তড়িৎ প্রভাবে আন্দোলিত হতে থাকে এবং নিজেরা কেন্দ্র হয়ে চতুর্দিকে আলো ছড়াতে থাকে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর জন্য এই প্রভাবের মানের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়। দীর্ঘ অপেক্ষা হ্রস্ব তরঙ্গে প্রাবল্য বেশি ফলে বর্ণালির লাল অংশের চেয়ে নীল অংশের এই প্রভাব প্রবলতর। সুতরাং বর্ণালির সবগুলি রং সমন্বিত রশ্মি মাধ্যমের মধ্যে নিয়ে যাবার সময় হলদে এবং লাল অংশ মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে সোজা চলে যাবে, তার অল্পই বিক্ষিপ্ত হবে, কিন্তু নীল অংশ ধারের দিকে বিক্ষিপ্ত হবে। এই প্রভাবের নাম হয়েছে টিন্‌ডাল প্রভাব।

লর্ড র‍্যালে এই প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে এই প্রকল্প (হাইপোথিসিস) উপস্থাপিত করেন যে আকাশের নীল রং এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় যে লালচে রং দেখা যায় তা বায়ুমণ্ডলে সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও জলকণাতে আলোর ব্যাপনের জন্য। আকাশ থেকে নীল আলো পাশের দিকে বিক্ষেপনের জন্য আর লালচে আলো বায়ুমণ্ডলের তলদেশ হয়ে সোজা আসে, লালচে দেখায় নীল অংশটি অন্য পাশে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে বলে। লর্ড র‍্যালে 1899 সালে এই বিষয়ে আর একটি ধারণা উপস্থাপিত করেন যে হয়ত বায়ুর অণুগুলি থেকেই আলোর বিক্ষেপণ প্রভাব উৎসারিত হচ্ছে।

1914 সালে ক্যাবান্নেস পরীক্ষা করে দেখাতে সক্ষম হন যে ধূলিশূন্য গ্যাস থেকেও আলোর বিক্ষেপন হয়।

কিন্তু বিভিন্ন কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বস্তুতে বিক্ষেপণের সূক্ষ্ম পরীক্ষায় দেখা গেল হিসেবে টিণ্ডোল প্রভাবে সূত্র অনুযায়ী যে ফলাফল পাওয়া উচিত বিক্ষিপ্ত আলোর অনেক ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে মিল নেই। এই প্রভাবের ভিত্তি যে প্রকল্প তাতে বলা হয়েছে অন্যান্য গুণের মধ্যে ধারে বিক্ষিপ্ত আলো ধ্রুবিত হবে। এটা কিন্তু পরীক্ষা করে পাওয়া গেল না।

এই আশাভঙ্গের পর বিক্ষিপ্ত আলোর প্রকৃতি নির্ণয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের সূত্রপাত হয়। এই অনুসন্ধানে

যারা সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন রামন তাদের অন্যতম। অণুদের প্রতিসাম্যে যে অসঙ্গতি দেখা যায় রামন তার ব্যাখ্যা খুঁজছিলেন। বিক্ষেপণ নিয়ে তাঁর এই গবেষণায় 1928 সালে রামন অপ্রত্যাশিত ভাবে এই চাম অত্যন্ত চমকপ্রদ আবিষ্কারটি করেন বিক্ষিপ্ত আলোর মধ্যে যে মূখ্য আলো থেকে বিক্ষেপণ তা ত আছেই আর সেই সঙ্গে ভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোও আছে যা মূখ্য আলোয় ছিল না।

এই নতুন রশ্মির ধর্ম আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানার জন্য শক্তিশালী মার্কারি ল্যাম্প থেকে মূখ্য আলো ব্যবহৃত হয় তার সামনে ফিলটার দিয়ে মূখ্য আলোকে একবর্ণী করা হয়। সেই আলো মাধ্যমে পড়ে যে বিক্ষেপণ করে তাও বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়। বর্ণালিচিত্রে প্রত্যেকটি তরঙ্গদৈর্ঘ বা কম্পাংকের জন্য একটি করে রেখা পড়ে। এতে রামন দেখতে পান যে মার্কারির জন্য নির্দিষ্ট রেখা ছাড়াও আরও কয়েকটি স্পষ্ট রেখা বর্ণালিতে রয়েছে, এগুলি মূল রেখার দুদিকেই বিদ্যমান। অন্য একটি মার্কারি রেখা ব্যবহার করেও দেখা গেল তার দুদিকে বাড়তি বর্ণালি রেখা থাকছে। তারপর মূখ্য আলো সরিয়ে নিলে নতুন বর্ণালি বিন্যাস এমন হয় যে মূল রেখা ও নতুন রেখাদের মধ্যে কম্পাংক দুরত্ব সমান থাকে।

ঘটনাটির সার্বভৌমত্ব পরীক্ষার জন্য রামন বহুসংখ্যক বস্তু মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে এই প্রভাব দেখেন।

আবিষ্কারের নামের সঙ্গে মিলিয়ে এই প্রভাবকে রামন প্রভাব বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন রামন আলোর ধর্ম বিষয়ে আধুনিক ধারনার ভিত্তিতে। এই নতুন ধারণা অনুযায়ী কোন বস্তুর দ্বারা আলোর নিঃসারণ বা শোষণ হতে পারে একমাত্র নির্দিষ্ট শক্তির ঝলকে আর অন্য কোন ভাবে নয়—এই শক্তির ফলককে বলা হয় আলোর কোয়াণ্টাম। সুতরাং আলোর শক্তির এক ধরনের পারমাণবিক চরিত্র থাকবে। আলোর কোয়াণ্টাম আলোক রশ্মির কম্পাংকের আনুপাতিক, সুতরাং কম্পাংক দ্বিগুণ হলে আলোর কোয়াণ্টমও দ্বিগুণ হবে।

আলোকশক্তি নিঃসারণ বা শোষণের সময় পরমাণুর আবস্থা বোঝার জন্য আমরা বোর বর্ণিত চিত্রটি সামনে ধরতে পারি—পরমাণুর কেন্দ্রে পজিটিভ আধান যুক্ত নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন বৃত্তাকার কক্ষপথে নেগেটিভ ইলেকট্রন ঘুরছে। প্রত্যেকটি ইলেকট্রনের গতি পথের ভিন্ন শক্তি থাকে এবং তা নির্ভর করে কেন্দ্রের থেকে দূরত্বের উপর।

কেবল কয়েকটি পথ সুস্থির হয়। এই পথগুলিতে ইলেকট্রন ঘোরার সময় কোন শক্তি নিঃসৃত হয় না। কিন্তু তা না হয়ে যদি একটি ইলেকট্রন উচ্চশক্তির পথ থেকে নিম্নতর শক্তি পথে পড়ে অর্থাৎ বাইরের দিকের পথ থেকে ভিতরের দিকের পথে পড়ে, তবেই আলোর নিঃসরণ হয় যার কম্পাংক এই দুটি পথের বৈশিষ্ট্য সূচক এবং বিকিরণে শক্তি থাকে আলোর কোয়াণ্টামে । সুতরাং পরমাণুতে বিভিন্ন সুস্থির গতি পথগুলির মধ্যে ইলেকট্রন ওঠানামার জন্য অনেক কম্পাংকের সৃষ্টি হতে পারে।

যখন একটি বিকিরণ এসে পরমাণুতে পড়ে তার থেকে শক্তি কখনই শোষিত হতে পারে না যদি ঐ পরমাণু সমপরিমাণ আলোর কোয়াণ্টাম নিঃসারণক্ষম হয়।

এখন রামন প্রভাব এই সূত্র লংঘন করছে। দেখা যাচ্ছে বর্ণালিতে রামন রেখার স্থান পরমাণুর নিজের কম্পাংকের সঙ্গে মিলছেনা এবং শক্তিপ্রদানকারী বিকিরণ থেকে সরে যাচ্ছে। এই আপাত বৈষম্য রামন ব্যাখ্যা করেছেন এবং বাইরে থেকে আসা আলোর কোয়াণ্টাম-এর সঙ্গে পরমাণ থেকে মুক্ত বা আবদ্ধ আলোর কোয়াণ্টামের মিলনের প্রভাবই এই রেখাগুলির উৎপত্তির কারণ বলেন। যখন বাইরে থেকে আসা আলোর কোয়াণ্টাম একটি পরমাণুতে পড়ে ঠিক সেই সময় যদি পরমাণু নিজেই একটি ভিন্ন মাত্রার আলোর কোয়াণ্টাম নিঃসারণ করে এবং দুটি আলোর কোয়াণ্টামের পার্থক্য মুক্ত বা বদ্ধ ইলেকট্রনের গতিপথগুলির মধ্যে ওঠানামা জনিত আলোর কোয়াণ্টামের সমতুল্য হয় কেবলমাত্র তবেই বাইরে থেকে আসা আলোর কোয়াণ্টাম শোষিত হবে। সেই ক্ষেত্রে পরমাণু একটি বাড়তি কম্পাংক নিঃসারণ করবে যার মনে হবে শক্তিপ্রদানকারী বিকিরণের

কম্পাংক এবং পরমাণু নিজের কম্পাংকের যোগফল বা বিয়োগফল। এই সব ক্ষেত্রে নতুন রেখাগুলি মুখ্য কম্পাংকের উভয় দিকে দলবদ্ধভাবে থাকবে এবং মুখ্য কম্পাংকের থেকে সব থেকে কাছে রামন রেখার দূরত্ব থেকে পরমাণু সর্বনিম্ন দোলন কম্পাংক বা অবলোহিত বর্ণালি পাওয়া যাবে। পরমাণু বা তার দোলনের ক্ষেত্রে যে যুক্তি দেখান হল, অণুর ক্ষেত্রে তা সর্বাংশে প্রযোজ্য।

এই ভাবে আমরা শক্তিপ্রদানকারী আলোর বর্ণালি রেখার পাশে অবলোহিত বর্ণালিকে সরিয়ে আনতে পারি। অণুর গঠন জানার জন্য রামন রেখার আবিষ্কার অসীম গুরুত্ব পূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত অবলোহিত দোলন বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করায় দুর্লভ বাধা ছিল কারণ বর্ণালির এই অংশ এত দূরে পড়ে যেখানে ফটোগ্রাফ প্লেট কাজ করে না। রামনের আবিষ্কারের এই বাধা অতিক্রম করা গেল এবং অণুর নিউক্লিয়াসের দোলন অনুসন্ধানের জন্য নতুন পথ উন্মুক্ত হল। যে সব কম্পাংকে ফটোগ্রাফিক প্লেট সুবেদী সেই অনুযায়ী মুখ্য রশ্মি বেছে নেওয়া যাক। রামন রেখার আকারে অবলোহিত বর্ণালি তার কাছে সরে আসবে এবং তার ফলে রেখাগুলির নির্ভুল মাপ সম্ভব হবে।

এইভাবে অতিবেগুনি বর্ণালিও রামন প্রভাবের সাহায্যে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। সুতরাং আমার অণুর দোলনের সর্বাঙ্গীন অনুসন্ধানের উপযোগী একটি সহজ ও নির্ভুল পদ্ধতি পেলাম।

আবিষ্কার হবার সময় থেকে এ ক'বছর রামন ও তাঁর সহকর্মীরা কঠিন, তরঙ্গ ও গ্যাসীয় বহু বস্তুর মধ্যে কম্পাংকের অনুসন্ধান করেছেন। বিভিন্ন অবস্থায় পুঞ্জীভূত হওয়ার জন্য অণু, পরমাণুদের ওপর প্রভাব পড়ে কিনা, তড়িৎ বিশিষ্ট বিয়োজমে আণবিক অবস্থা, কেলাসে অবলোহিত শোষণ বর্ণালি প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।

সুতরাং বস্তুর রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে রামন প্রভাব এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এনে দিয়েছে। এখন রামন প্রভাব নামে যে অত্যন্ত মূল্যবান অস্ত্রটি আমাদের হাতে এল তার সাহায্যে বস্তুর গঠন বিষয়ে আমার জ্ঞান আর কতদূর ভবিষ্যত প্রসারিত হয় তাই দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

স্যার ভেঙ্কটরামন গ্যাসের ব্যাপনে আপনার বিশিষ্ট গবেষণা এবং আপনার নামাঙ্কিত প্রভাব আবিষ্কারের জন্য রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স আপনাকে পদার্থ বিদ্যায় নোবেল প্রাইজ দিয়েছেন। বস্তুর গঠন বিন্যাস বিষয়ে জ্ঞানের নতুন রাস্তা খুলে দিয়েছে রামন-প্রভাব এবং এরই মধ্যে অনেক নতুন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

এখন আমি আপনাকে অনুরোধ করছি মহামান্য রাজার হাত থেকে আপনার পুরস্কার নিন।

আলোর আণবিক বিক্ষেপণ

নোবেল বক্তৃতা—সি. ভি. রামন

সমুদ্রের রং

বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা গেছে অনেক সময় একটি প্রাকৃতিক ঘটনার অনুসন্ধান থেকে সূত্রপাত হয় জ্ঞানের নতুন এক শাখার বিকাশ। এমনই একটি দৃষ্টান্ত আকাশের রং যা আলোক বিষয়ে অনেক গবেষণা অনুপ্রাণিত করেছে এবং স্বর্গত লর্ড র‍্যালে এর একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিলেন যা পরে পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত হয়। এইখান থেকে আমাদের আজকের বক্তৃতা শুরু। সবাইকার কাছে পরিচিত না হলেও বড় চমকপ্রদ সমুদ্রের রং। 1921 সালে ইউরোপ যাত্রার সময় ভূমধ্যসাগরের অপূর্বসুন্দর বিচিত্র নীলিমা দেখার প্রথম সুযোগ হয়। জলের অণু থেকে সূর্যের আলোক বিক্ষেপণই যে ঘটনাটির উৎস একথা অসসঙ্গত মনে হয়নি। কিন্তু ব্যাখ্যাটি যাচাই করতে গেলে বিভিন্ন তরল থেকে আলোর ব্যাপনের সূত্রগুলি ঠিকমত জানা দরকার এ কথা মনে

হয়েছিল এবং 1921 সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা ফিরেই এ বিষয়ে কাজ শুরু করি। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটি আরম্ভ করেছিলাম বিষয়টির তাৎপর্য তার চেয়ে অনেক গভীর ও সুদূর প্রসারী এবং এর মধ্যে গবেষণার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে মনে হয়েছিল যে আলোর বিক্ষেপণ নিয়ে পরীক্ষা পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে সমস্যাগুলির অনেক গভীরে নিয়ে যাবে এবং এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কলকাতায় পরবর্তীকালে আমাদের গবেষণার এটাই প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল।

হ্রাস বৃদ্ধির তত্ত্ব

কাজ শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যেই বোঝা গেল অণু থেকে আলোর বিক্ষেপন এক অতি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র যা কেবল গ্যাস বা বাষ্পের নয়, তরলে, কেলাসিত এবং অনিয়তাকার কঠিন বস্তুর মধ্যেও পরীক্ষা করা যেতে পারে এর উৎপত্তির প্রধান কারণ মাধ্যমে আণবিক গঠনের অগোছালো অবস্থা যার জন্য আলোকীয় ঘনাংকের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। অনিয়তাকার কঠিন বস্তু ছাড়া অন্যগুলির বেলায় এ ধরনের আণবিক বিশৃঙ্খলার কারণ বোধহয় তাপীয় উত্তেজনা এবং এক্সপেরিমেন্টের ফল থেকে তার সমর্থন পাওয়া গেছে। কার্যত অণুগুলি আলোকীয়ভাবে বিষমদৈশিক এবং তরলে সহজেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং এর ফলে অতিরিক্ত এক ধরনের বিক্ষেপণ সৃষ্টি করে। হ্রাসবৃদ্ধি জনিত বিক্ষেপণ থেকে এই বিক্ষেপণ সহজেই চিহ্নিত করা যায় কারণ এগুলি সম্পূর্ণ অধ্রুবিত আর হ্রাসবৃদ্ধির বেলায় অণুপ্রস্থদিকে সম্পূর্ণ ধ্রুবিত। বিষয়টির সম্বন্ধে বিস্তারিত মূল্যায়ন করা হয় এবং ফলাফল একটি প্রবন্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে 1922 সালে ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধে বর্ণিত সমস্যাগুলির সমাধানে আমার একদল দক্ষ সহযোগী এগিয়ে আসেন। 1922 থেকে 1927 সালে এই ছয় বছরে যে অসংখ্য পরীক্ষা কলকাতায় চালানো হয়েছে তার অল্প কয়েকটি সংক্ষেপে বলা সম্ভব। তরল ও বায়বীয় বস্তুতে বিভিন্ন তাপ ও তাপমাত্রায় আলোর বিক্ষেপণ নিয়ে গবেষণা করেন রামনাথন এবং পরীক্ষায় হ্রাসবৃদ্ধি তত্ত্বের সমর্থন পান। তার কাজ থেকে আরও জানা যায় যে তরলে ও বাষ্পে তাপমাত্রার সঙ্গে তীব্রতা বদলায় এবং সেই সঙ্গে ধ্রুবণ অবস্থা চমকপ্রদ পরিবর্তন হয়। কামেশ্বর রাও কাজ করেন তরলের মিশ্রণ নিয়ে এবং এই ধরনের তন্ত্রে ঘনাংক, উপাদান ও অণুর দিগ্‌বিন্যাস একই সঙ্গে হ্রাসবৃদ্ধির আলোক তত্ত্বীয় প্রমাণ সংগ্রহ করেন। শ্রীবাস্তব কাজ করেন কেলাস থেকে আলোর বিক্ষেপণ নিয়ে, কেলাসে তাপজনিত ঘনাংকের হ্রাসবৃদ্ধি এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে তার মাত্রার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তার পরীক্ষা। রামদাসের গবেষণা ছিল তরলের পৃষ্ঠে তাপজনিত আলোড়ন আলোর বিক্ষেপণে কি প্রভাব বিস্তার করে তার উপর। তিনি পৃষ্ঠটানের সঙ্গে পৃষ্ঠতলে চিত্রাভআলো বিকিরণের একটি সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করেন। তিনি দেখতে পান ক্রান্তিক উষ্ণতায় চিত্রাভতা (ওপালিসেন্স) পৃষ্ঠতল থেকে সমস্ত আয়তনে ছড়িয়ে পড়ে। সোগানি কাজ করেন তরলে এক্সরের অববর্তন নিয়ে, আলোকীয় ধর্মের সঙ্গে এর কোন যোগসূত্র আছে কিনা জানতে এবং এক্সরে বিক্ষেপণে হ্রাসবৃদ্ধি তত্ত্বের সমর্থন আছে কিনা জানতে।

অণুর বিষমসার

আগেই বলা হয়েছে তরল ও গ্যাসে বিক্ষিপ্ত আলোর ধ্রুবণ অবস্থা অণুর আলোকীয় বিষমসারের উপর নির্ভর করে। 1922 থেকে 1927 সাল পর্যন্ত কলকাতায় যে গবেষণা চালানো হয় তার একটা বড় অংশ ছিল এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা এবং আলোর বিভিন্ন বিকাশের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয় করা। কৃষ্ণান বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন তরলে পরীক্ষা করে পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করেন যে অণুর রাসায়নিক গঠনের উপর আলোকীয় বিষমসার নির্ভর করে। রামকৃষ্ণ রাও বহু সংখ্যক গ্যাস ও বাষ্পেব নমুনা থেকে বিক্ষিপ্ত আলোর বিধ্রুবণ নিয়ে গবেষণা

করেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন যা বিষয়টির অগ্রগতির বিশেষ সহায়ক হয়। ভেঙ্কটেশ্বরণ জলীয় দ্রবণে পরীক্ষা করে বিদ্যুৎ বিশ্লিষ্ট বিয়োজনে বিক্ষিপ্ত আলোর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। রামচন্দ্র রাও গবেষণা করেন লম্বাকৃতি অণু ও অতিমাত্রায় দ্রব্বী বস্তু নিয়ে তাপমাত্রার বিস্তীর্ণ প্লালা জুড়ে। তিনি তরলে বিক্ষিপ্ত আলোর বিধ্রুবণে আণবিক আকৃতি ও আণবিক সংযোজনের প্রভাব আবিষ্কার করেন।

তরলে পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলির সম্যক ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন ঘন মাধ্যমে আলো বিক্ষেপণের একটি আণবিক তত্ত্ব—সে কাজের ভার পড়ে রামনাথন, আমার নিজের এবং কৃষ্ণানের উপর। চিত্রাভতা (ওপালিসেন্স) নিয়ে একটি নতুন ফর্মুলা কষে বার করা হল যা আইনস্টাইনের ফর্মুলার সঙ্গে মিলল না বটে কিন্তু পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে মিলল। কৃষ্ণানের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধ মালায় দেখাবার চেষ্টা করেছি যে আলোক বিক্ষেপণে আলোকীয় বিষমসার বিষয়ে তত্ত্বীয় সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে তরল ও বায়বীয় বস্তুর আলোকীয় ও ডাই ইলেকট্রিক ধর্মের ব্যাখ্যা করা যায়, এবং তা ছাড়া এদের তড়িৎ, চৌম্বক ও যান্ত্রিক দ্বিপ্রতিসরণেরও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই সব পরীক্ষার শেষে আমরা তরলের আণবিক বিষমসারের সঙ্গে কেলাসিত কঠিন বস্তুর আলোকীয় তাড়িত ও চৌম্বিক বিষমসারের (এওলোট্রপি) একটা সম্বন্ধ স্থাপনে সক্ষম হই।

একটি নতুন প্রভাব

এতক্ষণ যে সব গবেষণার কথা বলা হল তার সবই প্রধানত আলোর সনাতনী তড়িচ্চুম্বকী তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং আলোর বিক্ষেপণ সমস্যা সমাধানের তার প্রয়োগ র‍্যালে ও আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে জড়িত। যাইহোক বিক্ষেপণের ব্যাখ্যায় যে আলোর কণাধর্মের প্রয়োগও হতে পারে তা অবজ্ঞা করা হয়নি বরঞ্চ 1922 সালের প্রবন্ধে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে এবং তা কম্পটনের এক্সরশ্মি বিক্ষেপণ আবিষ্কারের অন্তত এক বছর আগে। আমাদের এক্সপেরিমেন্টগুলি যদিও সাধারণভাবে তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্ব সমর্থন করে, তবু পরীক্ষা আরম্ভ করার প্রথমিক পর্যায়ে আমাদের কাছে এমন সব ঘটনা ধরা পড়েছিল যা সনাতনী ধারণার বাইরে। স্বচ্ছ তরল বা গ্যাস থেকে বিক্ষেপণ অতি ক্ষীণ হয়, আসলে তা ঘোলাটে মাধ্যমে যে টিন্ডাল প্রভাব দেখায় তার তুলনায় অনেক ক্ষীণতর। পরীক্ষা করার সময় আবিষ্কৃত হয় যে র‍্যালে-আইনস্টাইন বর্ণিত আণবিক বিক্ষেপণের সঙ্গে আরও ক্ষীণতর কিছু গৌণ বিকিরণ যার তীব্রতার মাত্রা সনাতন বিক্ষেপণ মাত্রার চেয়ে কয়েকশত গুণ কম এবং যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য মুখ্য বা আপাতিত বিকিরণের সমান নয়। এই ধরনের ঘটনা প্রথম দেখেন রামনাথন কলকাতায় 1923 সালে। কোন কোন তরলে (জলে, ইথারে, মিথাইল ও ইথাইল কোহলে) বিক্ষেপণে বিধ্রুবণ আপতিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে কেন পরিবর্তিত হয় তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করার সময় এই ধরনের ঘটনা দেখতে পান। রামনাথন লক্ষ্য করেন যে তরলটির সামগ্রিক রাসায়নিক শোধন নির্বাতে (ভ্যাকুয়ামে) বারংবার শ্লথপাতন সত্ত্বেও এই নতুন বিকিরণ অপরিবর্তিত তীব্রতায় বর্তমান থাকে। তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে এটা বস্তুর বৈশিষ্ট্য সূচক ধর্ম, কোন প্রতিপ্রভ অপবস্তুর জন্য নয়। কৃষ্ণান 1929 সালে অন্য অনেক তরলে অনুরূপ প্রভাব দেখতে পান এবং বরফে ও দর্শনীকাচে আরও চমকপ্রদ ঘটনা আমার চোখে ধরা পড়ে।

কম্পটন প্রভাবের আলোকীয় প্রতিরূপ

এই বিভ্রান্তিকারী ঘটনাগুলির কারণ জানতে স্বভাবতই আমাদের আগ্রহ হয় এবং 1925 সালে ভেঙ্কটেশ্বর তরল থেকে বিক্ষিপ্ত আলোর বর্ণালির ফটো তোলার চেষ্টা করেন। ইনি সূর্যের আলোর সামনে নানা রঙের পদার্থ ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ফল পাননি। রামকৃষ্ণ রাও বিক্ষেপণের বিধ্রুবণ পরীক্ষায়

1926-27 সালে অনেক সযত্ন অনুসন্ধানেও গ্যাসে ও বাষ্পে অনুরূপ প্রভাব পাননি। 1927 সালের শেষেরদিকে কৃষ্ণান আবার ওই সমস্যাটিতে মনোনিবেশ করেন। এই কাজ যখন চলছিল তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন সূত্র থেকে এই প্রভাবটির আসল চরিত্রের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিছু কিছু অত্যন্ত সান্দ্র জৈব তরল আছে যা কাচীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে। এই ধরনের তরল থেকে আলোর বিক্ষেপণ পরীক্ষায় আমাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। ভেঙ্কটেশ্বরণ এই সমস্যার মোকাবিলা করছিলেন এবং তিনি এক চমকপ্রদ ফল ঘোষণা করেন— অতিমাত্রায় শোধিত গ্লিসারিণে সূর্যালোকের বিক্ষেপণে স্বাভাবিক নীল রঙের বদলে উজ্জ্বল সবুজ রং দেখা যাচ্ছে। রামনাথন জলে ও কোহলে যে প্রভাবে আবিষ্কার করেছিলেন এ তারই অনুরূপ তবে এর তীব্রতা অনেক বেশি সুতরাং পরীক্ষা করা সহজ। এর পর আর কোন সময় নষ্ট করা হয়নি। আপতিত রশ্মিতে বিভিন্ন রঙের ফিল্টার ব্যবহার করা হল সৌর বর্ণালির এক একটি অংশ আলাদা করে ফেলতে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা গেল যে বিক্ষেপিত আলোর রং আপতিত আলোর রং থেকে ভিন্ন এবং লালের দিকে সরা। বিকিরণগুলি অতি ধ্রুবিতও বটে। এই তথ্যগুলি থেকেই পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এই প্রভাবটি আনুভবিক চরিত্র কম্পটন প্রভাবের অনুরূপ। বিক্ষেপণ প্রক্রিয়াতে যে বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের হ্রাস হয় কম্পটনের কাজ থেকে সে ধারণা সকলের জানা। সুতরাং গ্লিসারিনের তথ্য থেকে আমি বুঝতে পারি যে 1923 সাল থেকে আমরা যে ধাঁধার মধ্যে আটকে ছিলাম তা কম্পটন প্রভাবের আলোকীয় প্রতিরূপ। এই নতুন উপলব্ধির ফলে আমরা অন্যান্য বস্তুতে পরীক্ষা চালাই।

এই নতুন প্রভাব পরীক্ষা করায় আমাদের প্রধান অন্তরায় হচ্ছিল এর মাত্রার ক্ষীণতা। এই বাধা অতিক্রম করতে আমরা 7 ইঞ্চি ব্যাসের একটি প্রতিসরণী দূরবীণের সঙ্গে একটি স্বল্প ফোকাস দূরত্ব লেন্স যুক্ত করে সৌর রশ্মিকে অতি তীব্র অথচ পেন্সিলের লাইনের মত সরু রশ্মিতে পরিণত করতে সক্ষম হই। এই যন্ত্রটির সাহায্যে আপতিত ও বিক্ষিপ্ত রশ্মিতে অনুপূরক রঙের ফিল্টার ব্যবহার করে, ঠিক যেমন ভাবে 1923 সালে পরিবর্তিত বিকিরণ পৃথক করেছিলেন, অনেক তরল নমুনার এই প্রভাব সহজেই দেখা গেল এবং আর জানা গেল যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি অতি ধ্রুবিত। এই কাজে কৃষ্ণান আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করছেন। তিনি এই সময় লক্ষ্য করেন অনেক জৈব বাষ্পে ও এই প্রভাব বর্তমান। তিনি চোখে দেখে এদের ধ্রুবণের অবস্থা নির্ণয়েও সক্ষম হন। দেখা গেল CO_2 বা NO_2 র মত সংনমিত গ্যাসে, কেলাসিত বরফে এবং দর্শানী কাচে পরিবর্তিত বিকিরণ রয়েছে। এই সব পরীক্ষার ফলে আর কোন সন্দেহই রইল না যে এটি এক নতুন ধরনের আলোক বিক্ষেপণ এবং কম্পটন প্রভাবের অনুরূপ।

নতুন প্রভাবের বর্ণালি বিশ্লেষণ

1925 সালে এই প্রভাবের বর্ণালি পরীক্ষা অমীমাংসিত বলে পরিত্যক্ত হয়েছিল, এখন 7 ইঞ্চি লেন্সের সাহয্যে শক্তিশালী দীপন ব্যবহার করে বর্ণালি বিশ্লেষণ চোখে দেখে করা সম্ভব হল। আপতিত রশ্মিতে জাইস কোম্পানীর কোবাল্ট গ্লাস ফিলটার বসিয়ে ও বিকিরক বস্তু হিসেবে বিভিন্ন জৈব তরল ব্যবহার করে বিক্ষিপ্ত আলোর বর্ণালিতে দেখলাম নীলচে সবুজ একটি পটি বেগুনি নীল পটি থেকে কালো পটি দিয়ে পৃথকভাবে রয়েছে। বাড়তি ফিল্টার দিয়ে আপতিত আলোর পরিধি সীমিত করলে বর্ণালির দুটি অংশই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। এতে বোঝা গেল যে সূর্যের আলোর বদলে দরকার মার্কারি আর্কের বিশিষ্ট একবর্ণী আলো, তার সঙ্গে বড়মাপের ছিদ্র সমন্বিত সংগ্রাহী লেন্স এবং কোবাল্ট গ্লাস ফিলটার। এ নতুন ব্যবস্থায় নানা রকমের তরল ও কঠিন বস্তু থেকে বিক্ষিপ্ত আলোর বর্ণালি চোখে দেখে বিশ্লেষণ করা হয় এবং চমকপ্রদ ফল পাওয়া যায়। বর্ণালিতে সাধারণত একাধিক তীক্ষ্ণ রেখা বা পটি থাকে হাল্কা পশ্চাদপটের উপর এবং এর কোন অংশই মূল মার্কারি আর্ক বিকিরণে থাকে না।

কোয়ার্জ-মার্কারি ল্যাম্প থেকে আলো এত উজ্জ্বল এবং এটি একবর্ণী আলোর উৎস হিসেবে এত সুবিধাজনক যে অন্তত তরল ও কঠিন বস্তুতে বিক্ষিপ্ত আলোর বর্ণালির ফটো তোলা মোটেই দুঃসাধ্য নয়। হিলগারের তৈরি ছোট পোর্টেবল কোয়ার্জ স্পেক্‌টোগ্রাফের সাহায্যে প্রথম ছবিগুলি তোলা হয়। ঐ একই কোম্পানীর আর একটু বড় যন্ত্রের সাহায্যে কৃষ্ণন তরল ও কেলাসে খুব সন্তোষজনক বর্ণালি চিত্র পান যাতে যথাযোগ্য নির্ভুল পরিমাপ করা সম্ভব হয় এবং এরই সাহায্যে বেগুনির দিকে সরা রেখাগুলি প্রথম চিহ্নিত করা যায়। গ্যাস বা বাষ্প নিয়ে পরীক্ষা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল তবে তাদের উচ্চ চাপে রেখে কিছুটা সুরাহা হয়েছিল। রামদাস বড় ছিদ্র (F/1.8)* ও বিশেষ উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রথম সাধারণ আবহ চাপে গ্যাসীয় বস্তু থেকে (ইথার বাষ্প) বর্ণালি চিত্র নিতে সক্ষম হন।

ঘটনার পর্যবেক্ষণ ব্যাখ্যায় কম্পটন প্রভাবের তুলনা করা হয়েছে প্রাথমিক ইঙ্গিত হিসেবে। কম্পটনের কাজ বিজ্ঞানীদের কাছে স্বীকৃত হয়েছে এবং বিক্ষেপণ যে একটি ইউনিটারী প্রক্রিয়া যা নিত্যতা রীতি সঙ্গত এই ধারণাও স্বীকৃতি মিলেছে। এই ধারণা মানলে বলতে হবে যে বিপক্ষক কণা কোয়ান্টামের সঙ্গে সংঘাতে শক্তি অর্জন করে এবং কোয়ান্টামের শক্তি ক্ষয় হয় একই পরিমাণে, সুতরাং বিক্ষেপণের পর হ্রস্বতর কম্পাংক নিয়ে আসে। তাপগতি তত্ত্ব অনুযায়ী এর বিপরীত প্রক্রিয়াও সম্ভব হওয়া উচিত। এই ধারণার ভিত্তিতে পরীক্ষার ফলগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। মেপে দেখা সরণগুলির সঙ্গে অণুদের অবলোহিত কম্পাংকের মিল থেকে বোঝা গেল যে এই নতুন পদ্ধতি বস্তু গঠন বিন্যাস পরীক্ষা করে নির্ধারণের এক বিশাল ক্ষেত্র উন্মুক্ত হল।

প্রভাবের ব্যাখ্যা

মনে হয় এটা বলে রাখা ভাল যে পরীক্ষালব্ধ প্রভাবের ব্যাখ্যায় কম্পটন বর্ণিত নিত্যতারীতি সাহায্য করে বটে কিন্তু পর্যবেক্ষণের সকল ফলাফলের জন্য যথেষ্ট নয়। আণবিক বর্ণালির ক্ষেত্রে সকলেরই জানা যে একটি গ্যাস অণুর চারটি ভিন্ন ধরনের শক্তি থাকতে পারে, মাত্রার ক্রমানুসারে বললে—চলন, ঘূর্ণন, কম্পন ও ইলেকট্রন উদ্দীপন। এদের মধ্যে প্রথমটি বাদ দিয়ে বাকি তিনটির প্রত্যেকটি কোয়ান্টাম সূত্রী, এবং কোয়ান্টাম সংখ্যার ক্রমানুসারে পূর্ণসংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়। সুতরাং একটি অণুর গড় শক্তি অসংখ্য সম্ভাব্য মানের যে কোন একটি হয়। যদি আমরা ধরে নিই যে একটি অণুর সঙ্গে একটি কোয়ান্টামের সংঘাতে শক্তি আদান-প্রদানের ফলে অণুর শক্তি আপতিত শক্তির চেয়ে কম তবে বিক্ষিপ্ত আলোর বর্ণালিতে অসংখ্য নতুন রেখা দেখা যাবে—তার জটিলতা অণুর নিঃসারণ বা শোষণ বর্ণালিতে পাওয়া পটির (ব্যণ্ডের) সঙ্গেই তুলনীয়। যে চিত্রগুলি দেখা যায় তার থেকে জটিল আর কিছু ভাবা যায় না। পরীক্ষাগুলির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হল বহু পরমাণু সমন্বিত জটিলতম অণুর বিক্ষিপ্ত আলোর চমৎকার সরল বর্ণালি পাওয়া। এই সরলতার সঙ্গে নিঃসারণ বা শোষণ বর্ণালির চরম জটিলতার বৈপরিত্য লক্ষণীয়। এই সরলতাই আলোক বিক্ষেপণ বিদ্যার বিশেষ তাৎপর্য ও মূল্য। এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে পরীক্ষায় পাওয়া এই প্রভাব নিত্যতারীতি প্রয়োগ করে কোনদিনই পাওয়া যেত না।

বরঞ্চ নীলসবোর সনাতনী ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সংগামিতার (করেসপণ্ডেন্স) বিষয়ে যে সূত্র দিয়েছেন তার সাহায্যে আসল ঘটনাটির অন্তর্নিহিত সত্য পাওয়া যায়। আলোক বিক্ষেপণের সনাতনী তত্ত্ব বলে যদি অণু চলন্ত, ঘুরন্ত বা কম্পনরত অবস্থায় আলোক বিক্ষেপণ করে তবে, বিক্ষিপ্ত বিকিরণে আপতিত তরঙ্গের থেকে ভিন্ন কতকগুলি কম্পাংক থাকতে পারে। আমরা এক্সপেরিমেণ্টে যা ফলাফল দেখেছি তার সঙ্গে এই

* ছবিটি এই বইতে ছাপা হয়নি।

সনাতনী চিত্রটির অনেকাংশে মিল আছে। পরীক্ষায় দেখা কম্পাংকের পরিবর্তন যে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় চলন, ঘূর্ণন ও কম্পন এই তিন শ্রেণীতে পড়ে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পরীক্ষায় যে সব বৃত্তি সূত্রগুলি পাওয়া যায় তারও ব্যাখ্যা এতে মেলে—উদাহরণ : বিক্ষিপ্ত আলোর থেকে কম্পন জনিত কম্পাংকে কেন উপসুর (ওভারটোন) বা যুক্তস্বন (কম্বিনেশান) থাকে না কেবল মূল (ফানডামেন্টাল) থাকে। অথচ শোষণ বা নিঃসারণ বর্ণালিতে উপসুর ও যুক্তস্বন বৈশিষ্ট বলে গণ্য। সনাতনী পদ্ধতি থেকে এমন কি পরিবর্তিত কম্পাংকের বিকিরণের তীব্রতা ও ধ্রুবণের একটা মোটামুটি আন্দাজ দিতে পারে। তা সত্ত্বেও অনেক বিষয়ে সনাতনী চিত্রের সংশোধন প্রয়োজন এমন কি প্রভাবটি একটি আঙ্গিক (কোয়ালিটেটিভ) বর্ণনা দেবার জন্যও। তাই আমাদের কোয়ান্টাম সূত্রের শরণাপন্ন হতে হবে। বোরের সংগামিতা সূত্রের ভিত্তিতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় যে যে নতুনতর অগ্রগতি হয়েছে এবং ক্লামারস ও হাইসেনবার্গের কাজের সাহায্যে পরীক্ষালব্ধ ফলগুলির ব্যাখ্যায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্বাস দেয়। কিন্তু যতদিন না অণুর গঠন বিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হচ্ছে এবং নতুন প্রভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে মাত্রিক পরীক্ষালব্ধ ফল সংগৃহীত হচ্ছে, ততদিন সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করা ঠিক হবে না।

প্রভাবটির তাৎপর্য

প্রভাবটি সার্বিকতা, পরীক্ষা পদ্ধতির সুবিধা এবং বর্ণালির সারল্য পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অনেক সমস্যা সমাধানের পরীক্ষার সুযোগ এনে দেবে। বাস্তবিক পক্ষে বলা যায় যে সেটাই এই প্রভাবের প্রধান তাৎপর্য। বর্ণালি থেকে নির্ণীত কম্পাংকের পার্থক্য, বর্ণালিতে রেখাগুলির বোধ ও গুণাবলী এবং বিক্ষিপ্ত বিকিরণের তীব্রতা ও ধ্রুবণতার মাত্রা থেকে বিকিরক বস্তুর আণবিক গঠন বিন্যাসের চূড়ান্ত রূপটির বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়। পরীক্ষামূলক গবেষণায় দেখা গেছে বর্ণালির এই বৈশিষ্ট্যগুলি খুব বেশি পরিমাণে নির্ভর করে তাপমাত্রা বা সমাবেশ (এগ্রিফেশান) জাতীয় ভৌত ধর্মের উপর, মিশ্রণ, দ্রবণ, আণবিক অনুষঙ্গ (অ্যাসোসিয়েশন), পলিমারকরণ (পলিমারাইজেশান) প্রভৃতি ভৌত রাসায়নিক ধর্মের উপর এবং সর্বোপরি রাসায়নিক গঠনের উপর। দেখা যাচ্ছে যে বস্তুর গঠন বিষয়ে গবেষণার এক অসীম সুযোগ এনে দিয়েছে বর্ণালি বিজ্ঞানের এই নতুন ক্ষেত্র। আশা করা যায় এই সব গবেষণার ফলে আলোর ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হবে এবং আলো ও বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার চরিত্রও পরিষ্কার হবে।

উপসংহার ও কিছু মন্তব্য

পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিতে কতকগুলি সরল অণুতে এই প্রভাবের মাত্রিক জ্ঞান মৌলিক অগ্রগতির এক বিপুল সম্ভাবনা তুলে ধরেছে। তরলাকৃত গ্যাসে ম্যাকলেনানের কাজ এবং আর. ডব্লু. উড ও রাসেরটির কাজ বিজ্ঞানের এই বিভাগে পথ প্রদর্শক করে—এরা সর্বজন সমাদৃত। সরল রাসায়নিক গঠনযুক্ত কেলাসে এই প্রভাবের সাহায্যে বিস্তারিত বিশ্লেষণের গুরুত্ব অসীম। এ বিষয়ে হীরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হীরার উপর কাজ করেছেন রামস্বামী, রবার্টসন, ফক্স এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভগবন্তম। এই পরীক্ষায় এমন সব আশ্চর্য তথ্য পাওয়া গেছে যার সাহায্যে কেলাসিত অবস্থার সম্পূর্ণ উপলব্ধির নতুন পথ দেখাবে। আমি কৃষ্ণমূর্তির কাজের দিকেও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিক্ষেপন বর্ণালিতে পাওয়া বর্ণালি রেখার তীব্রতা যে রাসায়নিক বন্ধকের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল কৃষ্ণমূর্তি তা প্রামাণ করেন। তাছাড়া তিনি রাসায়নিক সংযোগে সমধ্রুবী থেকে অসমধ্রুবী নমুনাতে রূপান্তরও লক্ষ্য করেন। স্থানচ্যুত রেখাদের যে তীব্রতা দেখা যায় তা আপাতদৃষ্টিতে কেলাসগুলির উপচুম্বকত্বের উপর নির্ভর করে—কৃষ্ণমূর্তির এই পর্যবেক্ষণ এই নতুন গবেষণা ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সি. ভি. রামনের প্রকাশিত প্রবন্ধ ও পুস্তকের তালিকা

(যে সব পাঠক অধ্যাপক রামনের মূল রচনা পড়তে আগ্রহী, তাদের সুবিধার জন্য তালিকা ইংরাজীতে রাখা হল।

1906 Unsymmetrical diffraction bands due to a rectangular aperture, *Phil. Mag.*, (6), 12, 494.

1907 Newton's rings in polarized light. *Nature*, London. 76, 636.

1907 Curvature method of determining the surface tension of liquids, *Phil. Mag.*, 14, 591.

1908 Secondary waves of light, *Nature*, London. 78, 55.

1909 The small motion at the modes of a vibrating string, *Nature*, London 82. 9.

1909 The maintenance of forced oscillations of a new type, *Nature*. London, 82. 156.

1909 The photometric measurement of the obliquity factor of diffraction. *Nature*, London, 82. 69.

1909 The experimental study of Huygen's secondary waves. *Phil. Mag.*. (6). 17, 204.

1910 Maintenance of forced oscillations, *Nature*. London. 82, 428.

1911 Photographs of vibration curves, *Phil. Mag.*, (6). 21, 615.

1911 Remarks on a paper by J. S. Stokes on some curious phenomena observed in connection with Melde's experiment, *Phys. Rev.*, 32. 307.

1911 The small motion at the nodes of a vibrating string, *Phys. Rev.*, 32, 309.

1911 Photometric measurement of the obliquity factor of diffraction, *Phil. Mag.*, (6), 21. 618.

1912 On the maintenance of forced oscillations of a new type. *Phil. Mag.*, (6), 24. 513.

1912 Some remarkable cases of resonance. *Phys. Rev.*, 35. 449.

1912 Experimental investigations on the maintenance of vibrations, *Bull. Ind. Assoc. Cult. Sci.*, No. 6.

1914 The maintenance of vibrations, *Phys. Rev.*, 4, 12.

1914 On motion in a periodic field of force, *Bull. Ind. Assoc. Cult. Sci.*, No. 11.

1914 Dynamical theory of the motion of bowed strings, *Buli. Ind. Assoc. Cult. Sci.* No. 11.

1915 On motion in a periodic field of force, *Phil. Mag.*, (6), 29. 15

1915 On the maintenance of combinational vibrations by two simple harmonic forces, *Phys. Rev.*, 5, 1.

1915 On intermittent vision, *Phil. Mag.*, (6), 30, 701.

1916 On the 'Wolf note' of the violin and cello. *Nature*, London, 97, 362.

1916 On the 'Wolf note' in bowed stringed instruments. *Phil. Mag.*, (6), 32, 391.

1916 (With S. Appaswamiyer) On discontinuous wave-motion, *Phil. Mag.*, (6), 31, 47.

1917 On the alterations of the tone produced by a violin mute, *Nature*, London 100, 84.

1917 (With A. Dey) On discontinuous wave-motion. Part II, *Phil. Mag.*, (6), 33, 203.

1917 (With A. Dey) On discontinuous wave-motion, Part III, *Phil. Mag.*, (6), 33, 352.

1917 (With A. Dey) The maintenance of vibrations by a periodic field of force, *Phil. Mag.*, (6). 34, 129.

1918 On the 'Wolf note' in bowed stringed instruments, *Phil. Mag.*, (6), 35, 493.

1918 'Wolf note' in pizzicato playing. *Nature*. London. 101. 264.

1918 On the mechanical theory of the vibrations of bowed strings and of musical instruments of the violin family with experimental verification of the results. Part I, *Bull Ind. Assoc. Cult. Sci.*, No. 15.

1918 (With P. N. Ghosh) The colours of the striae in mica. *Nature*, London, 102. 205.

1918 The photographic study of impact at minimal velocities, *Phys. Rev.*, 12. 442.

1919 On the partial tones of bowed stringed instruments. *Phil. Mag.*, (6), 38, 573.

1919 An experimental method for the production of vibrations, *Phys. Rev.*, 14, 446.

1919 Note on the theory of sub-synchronous maintenance. *Proc. R. Soc.*, London. A. 95, 544.

1919 On the diffraction figures due to an elliptic aperture, *Phys. Rev.* 13, 259.

1919 The Doppler effect in the molecular scattering of radiation. *Nature*. London. 103, 165.

1919 Percussion figures in isotopic solids. *Nature*, London. 104, 113.

1920 (With B. Banerji) On Kaufmann's theory of the impact of the pianoforte hammer, *Proc. R. Soc.*, London, A. 97, 99.

1920 On the mechanical violin-player for acoustical experiments. *Phil. Mag.*, (6). 39, 535.

1920 (With S. Kumar) Musical drums with harmonic overtones, *Nature*. London, 104, 500.

1920 Experiments with mechanically-played violins, *Proc. Ind. Assoc. Cult Sci.*, 6, 19.

1920 (With A. Dey) On the sounds of splashes, *Phil. Mag.*, (6), 39, 145.

1921 (With G.A. Sutherland) The whispering gallery phenomenon at St. Paul's Cathedral. *Nature*, London 108, 42.

1921 (With G.A, Sutherland) On the whispering gallery phenomenon, *Proc. R. Soc.*, London, A. 100, 424.

1921 (With G.L. Datta) On Quetelet's rings and other allied phenomena, *Phil. Mag.*, (6), 42, 826.

1921 (With B. Banerji) Colours of mixed plates, Part I, *Phil. Mag.*, (6), 41, 338.

1921 (With B. Banerji) Colours of mixed plates, Part II, *Phil. Mag.*, (6), 41, 860.

1921 (With K. Seshagiri Rao) On the colours of mixed plates, Part III, *Phil. Mag.*, (6), 42, 679.

1921 The colours of breathed-on plates, *Nature*, London, 107, 714.

1921 A method of improving visibility of distant objects, *Nature*, London, 108, 242.

1921 The colour of the sea, *Nature*, London, 108, 367.

1921 The molecular scattering of light in liquids and solids, *Nature*. London, 108, 402.

1921 Smoky quartz, *Nature*, London, 108, 81.

1921 Conical refraction in biaxial crystals, *Nature*. London, 107, 747.

1921 On some Indian stringed instruments, *Proc. Ind. Assoc. Cult. Sci.*, 7, 29.

1921 Nature of vowel sounds, *Nature*, London, 107, 332.

1922 On whispering galleries, *Proc. Ind. Assoc. Cult. Sci.*, 7, 159.

1922 The acoustical knowledge of the ancient Hindus, *Asut. Mook. Sil. Jub. Vol.*

1922 Einstein's aberration experiment, *Nature*, London, 109, 477,

1922 On Einstein's aberration experiment, *Astrophy. J.*, 56, 29.

1922 (With N.K. Sethi) On the convection of light in moving gases, *Phil. Mag.*, (6), 43, 447.

1922 Colours of tempered steel, *Nature*, London, 109, 105.

1922 On the phenomenon of radiant spectrum, *Phil. Mag.*, (6), 43, 357.

1922 The radiant spectrum. *Nature*, London, 109. 175.

1922 Anisotropy of molecules, *Nature*, London, 109, 75.

1922 Optical observation of the thermal agitation of the atoms in crystals, *Nature*, London, 109, 42.

1922 Molecular structure of amorphous solids, *Nature*, London, 109, 138.

1922 Diffraction by molecular clusters and the quantum structure of light, *Nature*, London. 109, 444.

1922 Molecular aelotropy in liquids, *Nature*, London, 110, 11.

1922 Molecular diffraction of light, *Nature*, London, 110, 505.

1922 Opalescence phenomena in liquid mixtures, *Nature*, London, 110, 77.

1922 Transparency of liquids and the colour of the sea, *Nature*. London, 110, 280.

1922 On the molecular scattering of light in water and the colours of the sea, *Proc. R. Soc.*, London, A, 101, 64.

1922 (With V.S. Tamma) On a new optical property of biaxial crystals. *Phil. Mag.*, (6), 43. 510.

1922 The spectrum of neutral helium, *Nature*, London, 110, 700.

1922 *Molecular diffraction of light*. Calcutta University Press.

1923 (With K. R. Ramanathan) On the molecular scattering of light in liquid mixtures, *Phil. Mag.*, (6), 45, 213.

1923 (With K. R. Ramanathan) On the molecular scattering of light in dense vapours and gases, *Phil. Mag.*. (6), 45, 113.

1923 (With K.R. Ramanathan) Molecular scattering of light in carbon dioxide at high pressures, *Proc. R. Soc.*, London, A, 104, 357.

1923 (With K. Seshagiri Rao) On the molecular scattering and extinction of light in liquids and the determination of the Avogadro's constant, *Phil. Mag.*, (6), 45, 625.

1923 The scattering of light by anisotropic molecules, *Nature*, London, 112, 165.

1923 Thermal opalescence in crystals and the colour of ice in glaciers, *Nature*, London, 111, 13.

1923 (With K. Seshagiri Rao) On the polarization of the light scattered by gases and vapours, *Phil. Mag.*, (6), 46, 426.

1923 The scattering of light by liquid and solid surfaces, *Nature*, London, 112, 281.

1923 Scattering of X-rays in liquids, *Nature*, London, 111, 185.

1923 Nature of liquid state, *Nature*, London, 111, 428.

1923 (With K. R. Ramanathan) Diffraction of X-rays in liquids, liquid mixtures, fluid crystals and amorphous solids, *Proc. Ind. Assoc. Cult. Sci.*, 8, 127.

1923 A theory of the viscosity of liquids, *Nature*, London, 111, 532.

1923 The viscosity of liquids, *Nature*, London, 111, 600.

1923 (With A.S. Ganesan) On the spectrum of neutral helium, *Astrophys. J.*, 57, 243.

1924 Of the mean distance between neighbouring molecules in a fluid, *Phil. Mag.*, 47, 671.

1924 (With K. Banerji) The optical properties of amethyst quartz, *Trans. Opt. Soc. Amer.*

1925 On the nature of the disturbance in the second medium in total reflection. *Phil. Mag.*, 50, 812.

1925 (With K.S. Krishnan) On the diffraction of light by spherical obstacles, *Proc. Phys. Soc.*, 38, 350.

1925 Die Zerstreung des Lichtes durch dielektrische Kugel, *Zeit. f. Phys.*, 33, 870.

1925 (With L. A. Ramdas) The scattering of light by liquid boundaries and its relation to surface tension, Part I. *Proc. R. Soc.*, London, A, 108, 561.

1925 (With L.A. Ramdas) The scattering of light by liquid boundaries and its relation to surface tension, Part II, *Proc. R. Soc.*, London, A, 109, 150.

1925 (With L. A. Ramdas) The scattering of light by liquid boundaries and its relation to surface tension, Part III, *Proc. R. Soc.*, London, A, 109, 272.

1925 (With S. K. Datta) Anomalous dispersion and multiple lines in spectra, *Nature*, London, 115, 946

1925 The effect of dispersion on the interference figures of crystals, *Nature*, London, 113, 127.

1926 The subjective analysis of musical tones, *Nature*, London, 117, 450.

1926 (With S. K. Datta) On Brewster's bands, Part I, *Trans. Opt. Soc. Amer.*, 27, 51.

1926 (With K. S. Krishnan) On the diffraction of light by spherical obstacles, *Proc. Phy. Soc.*, 38, 350.

1926 The optical study of percussion figures, *J. Opt. Soc. Amer.*, 12, 387.

1926 On the total reflection of light, *Proc. Ind. Assoc. Cult. Sci.*, 9, 271.

1926 Huygens's principle and the phenomena of total reflection, *Trans. Opt. Soc.*, London, 28, 149.

1926 (With K. S. Krishnan) Electrical polarity of molecules, *Nature*, London, 118, 302.

1926 The birefringence of crystalline carbonates, nitrates and sulphates, *Nature*, London, 118, 264.

1927 Musikinstrumente und ihre Klange, *Handbuch der Physik*, VIII, p.354.

1927 (With K.S. Krishnan) The diffraction of light by metallic screens, *Proc. R. Soc.*, London, A, 116, 254.

1927 (With L.A. Ramdas) On the thickness of the optical transition layer in the liquid surfaces, *Phil. Mag.*, (7), 3, 220.

1927 (With I. Ramakrishna Rao) Diffraction of light by a transparent lamina, *Proc. Phy. Soc.*, 39, 453.

1927 Optical behaviour of protein solutions, *Nature*, London, 120, 158.

1927 Relation of Tyndall effect to osmotic pressure in collidal solutions, *Ind. J. Phys.*, 2, 1.

1927 The scattering of light in amorphous solids, *J. Opt. Soc., Amer.*, 15, 185.

1927 The molecular scattering of light in binary liquid mixtures, *Phil. Mag.*, (7), 4, 447.

1927 Thermal degeneration of X-ray haloes in liquids, *Nature*, London, 120, 770.

1927 (With C. M. Sogani) X-ray diffraction in liquids, *Nature*, London, 119, 601.

1927 (With C. M. Sogani) X-ray diffraction in liquids, *Nature*, London, 120, 514.

1927 Thermodynamics, wave theory and the Compton effect, *Nature*, London, 120, 950.

1927 (With I. Ramakrishna Rao) Magnetic double refraction, *Nature*, London, 119, 528.

1927 (With K.S. Krishnan) Magnetic double refraction in liquids, Part I : Benzene and its derivatives, *Proc. R. Soc.*, London, A, 113, 511.

1927 (With K.S. Krishnan) A theory of electric and magnetic birefringence in liquids, *Proc. R. Soc.*, London, A, 117, 1.

1927 (With K.S. Krishnan) The magnetic anisotropy of crystalline nitrates and carbonates, *Proc. R. Soc.*, London, A, 115, 549.

1927 (With K.S. Krishnan) La constant de birefringence magnetique du benzene, *C.R. hebd. Acad. Sci.*, Paris, 184, 449.

1927 (With K.S. Krishnan) Electrical double refraction in relation to polarity and optical anisotropy of molecules. Part I : Gases and Vapours. *Phil. Mag.*, (7), 3, 713.

1927 (With K.S. Krishnan) Electrical double refraction in relation to polarity and optical anisotropy of molecules, Part II : Liquids, *Phil. Mag.*, (7), 3, 724.

1927 (With K.S. Krishnan) The Maxwell effect in liquids, *Nature*, London, 120, 726.

1928 (With K.S. Krishnan) A theory of light-scattering in liquids, *Phil. Mag.*, (7), 5, 499.

1928 (With C.M. Sogani) A critical absorption photometer for the study of the Compton effect, *Proc. R. Soc.*, London, A, 119, 526.

1928 A classical derivation of the Compton effect, *Ind. J. Phy.*; 3, 357.

1928 (With K.S. Krishnan) A theory of the optical and electrical properties of liquids, *Proc. R. Soc.*, London, A, 117, 589.

1928 (With S.C. Sirkar) Disappearance and reversal of the Kerr effect, ***Nature***, London. 121, 794.

1928 (With K.S. Krishnan) A new type of secondary radiation, ***Nature***, London, 121, 501.

1928 A change of wave-length in light-scattering. ***Nature***, London, 121, 619.

1928 (With K.S. Krishnan) The optical analogue of the Compton effect, ***Nature***, London, 121, 711.

1928 A new radiation, *Ind. J. Phys.*, 2, 387.

1928 (With K.S. Krishnan) A new class of spectra due to secondary radiation, Part I, *Ind. J. Phys.*, 2, 339.

1928 (With K.S. Krishnan) Polarization of scattered light quanta, ***Nature***, London, 122, 169.

1928 (With K.S. Krishnan) Rotation of molecules induced by light, ***Nature***, London, 122, 882.

1928 (With K.S. Krishnan) Molecular spectra in the extreme infrared, ***Nature***, London, 122, 278.

1928 (With K.S. Krishnan) The negative absorption of radiation. ***Nature***. London, 122, 12.

1928 (With K.S. Krishnan) A theory of the birefringence induced by flow in liquids, *Phil. Mag.*, (7), 5, 769.

1929 Investigations of scattering of light, ***Nature***, London, 123, 50.

1929 The theory of light-scattering in liquids, *Phil. Mag.*, (7), 7. 160.

1929 Colour and optical anisotropy of organic compounds, ***Nature***. London, 123, 494.

1929 (With P. Krishnamurti) A new X-ray effect, ***Nature***, London, 124, 53.

1929 Magnetic behaviour of organic crystals, ***Nature***, London, 123, 605.

1929 Diamagnetism and crystal structure, ***Nature***. London, 123, 945.

1929 Anomalous diamagnetism, ***Nature***, London, 124, 412.

1929 (With S. Bhagavantam) The relation between colour and molecular structure in organic compounds, *Ind. J. Phys.*, 4, 57.

1929 (With K.S. Krishnan) The production of new radiations by light-scattering. Part I, *Proc. R. Soc.*, London, A, 122, 23.

1929 Investigations of molecular structure by light-scattering, *Trans. Faraday Soc.*, 25, 781.

1930 Diamagnetism and molecular structure, *Proc. Phys. Soc.*, London, 42, 309.

1930 The molecular scattering of light, Nobel Lectures, 1922-1941, p.267.

1931 India's debt to Faraday, ***Nature***, London, 128, 362.

1931 (With S.W. Chinchalkar) A new type of magnetic birefringence, ***Nature***, London, 128, 758.

1931 (With S. Bhagavantam) Evidence for the spin of the photon from light-scattering, ***Nature***, London, 128, 114.

1931 Angular momentum of light, *Nature*, London, 128, 545.

1931 Atoms and molecules as Fitzgerald oscillators, *Nature*, London, 128, 795.

1931 (With S. Bhagavantam) Experimental proof of the spin of the photon, *Ind. J. Phys.*, 6, 353.

1931 Doppler effect in light-scattering, *Nature*, London, 128, 636.

1932 (With S. Bhagavantam) Experimental proof of the slpin of the photon, *Nature*, London, 129, 22.

1934 Indian musical drums, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 1, 179.

1934 The origin of the colours in the plumage of birds, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 1, 1.

1934 On iridescent shells, Part I : Introductory, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 1, 567.

1934 On iridescent shells, Part II : Colours of laminar diffraction, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 1, 574.

1934 On iridescent shells, Part III : Body colours and diffusion haloes, *Pro. Ind. Acad. Sci.*, 1, 859.

1935 (With B.V. Raghavendra Rao) Nature of thermal agitation in liquids, *Nature*, London, 135, 761.

1935 (With N.S. Nagendra Nath) The diffraction of light by high frequency sound waves, Part I, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 2, 406.

1935 (With N.S. Nagendra Nath) The diffraction of light by high frequency sound waves, Part II: *Proc. Ind. Acad.* Sci., 2. 413.

1936 (With N.S. Nagendra Nath) The diffraction of light by high frequency sound waves, Part III : Doppler effect and coherence phenomena, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 3, 75.

1936 (With N.S. Nagendra Nath) The deffraction of light by high frequency sound waves, Part IV : Generalised theory, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 3, 119.

1936 (With N.S. Nagendra Nath) The diffraction of light by high frequency sound waves, Part V : General considerations (oblique incidence and amplitude changes), *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 3, 459.

1936 (With N.S. Nagendra Nath) Diffraction of light by ultrasonic waves, *Nature*, London, 138, 616.

1937 (With B.V. Raghavendra Rao) Acoustic spectrum of liquids, *Nature*, London, 139, 584.

1938 (With B.V. Raghavendra Rao) Light-scattering and fluid viscosity, *Nature*, London, 141, 242.

1939 (With K. Subbaramiah) On the wave-like character of periodic precipitates, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 9, 455.

1939 (With V.S. Rajagopalan) Haidinger's rings in soap bubbles, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 10, 317.

1939 (With V.S. Rajagopalan) The structure and optical characters of iridescent glass, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 9, 371.

1940 (With P. Nilakantan) A new X-ray effect, *Curr. Sci.*, 9, 165.

1940 (With P. Nilakantan) Reflection of X-rays with change of frequency, Part I :

1940 Theoretical discussion, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 11, 379.

1940 (With P. Nilakantan) Reflection of X-rays with change of frequency, Part II : The case of diamond, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 11, 389.

1940 (With P. Nilakantan) Reflection of X-rays with change of frequency, Part III : The case of sodium nitrate, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 11, 398.

1940 (With N.S. Nagendra Nath) Quantum theory of X-ray reflection and scattering, Part I : Geometric relations, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 12, 83.

1940 (With P. Nilakantan) Reflection of X-rays with change of frequency, Part IV : Rock salt, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 12, 141.

1940 (With V.S. Rajagopalan) Colours of stratified media, I : Ancient decomposed glass, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 11, 469.

1940 (With N.S. Nagendra Nath) The two types of X-ray reflection in crystals, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 12, 427.

1941 New methods in the study of light scattering, Part I : Basic ideas, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 14, 228.

1941 Crystals and photons, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 13, 1.

1941 The quantum theory of X-ray reflection : Basic ideas, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 14, 317.

1941 Quantum theory of X-ray reflection : Mathematical formulation, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 14, 332.

1941 (With P. Nilakantan) Quantum theory of X-ray reflection : Experimental confirmation, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 14, 356.

1941 (With V.S. Rajagopalan & T.M.K. Nedungade) Conical refraction in naphthalene crystals, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 14, 221.

1942 The phenomena of conical refraction, *Curr. Sci.*, 11, 44.

1942 Newton and the history of optics, *Curr. Sci.*, 11, 453.

1942 New concepts of the solid state, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 15, 65.

1942 Spectroscopic investigation of the solid and liquid state, *Curr. Sci.*, 11, 225.

1942 The physics of the diamond, *Curr. Sci.*, 11, 261.

1942 The nature of the liquid state, *Curr. Sci.*, 11, 303.

1943 The vibration spectrum of a crystal lattice, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 18, 337.

1943 The structure and properties of diamond, *Curr. Sci.*, 12, 33.

1943 Astronomical research in India : I, *Curr. Sci.*, 12, 197.

1943 Astronomical research in India : II, *Curr. Sci.*, 12, 289.

1943 Astronomical research in India : III, *Curr. Sci.*, 12, 313.

1944 The four forms of diamond, *Curr. Sci.*, 12, 145.

1944 The crystal symmetry and structure of diamond, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 19, 189.

1944 The nature and origin of the luminescence of diamond, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 19, 199.

1944 (With G.R. Rendall) Birefringence patterns of diamond, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 19, 265.

1945 Centenary of the Faraday effect, *Curr. Sci.*, 14, 281.

1946 The diamond and its teachings, *Curr. Sci.*, 15, 205.

1946 New concepts of crystal structure, *Curr. Sci.*, 15, 329.

1946 (With S. Ramaseshan) The crystal forms of diamond and their significance, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 24, 1.

1947 New paths in crystal physics, *Curr. Sci.*, 16, 67.

1947 The infra-red spectrum, *Curr. Sci.*, 16, 359.

1947 The vibration spectra of crystals, Part I, Basic theory, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 26, 339.

1947 The vibration spectra of crystals, Part II, The case of diamond, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 26, 356.

1947 The vibration spectra of crystals, Part III, Rocksalt, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 26, 370.

1947 The vibration spectra of crystals, Part IV, Magnesium oxide, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 26, 383.

1947 The Vibration spectra of crystals, Part V, Lithium and sodium fluorides, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 26, 391.

1947 The vibration spectra of crystals, Part VI, Sylvine, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 26, 396.

1948 The eigenvibrations of crystal structures, *Curr. Sci.*, 17, 1.

1948 Dynamic X-ray reflection in crystals, *Curr. Sci.*, 17, 65.

1949 The theory of the Christiansen experiment, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 29, 381.

1949 (With S. Rameseshan) The Christiansen experiment with spherical particles, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 30, 211.

1949 (With S. Ramaseshan) Diffraction of light by transparent spheres and spheroids : The Fresnel patterns, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 30, 277.

1950 The optical anisotropy and heterogineity of vitreous silica, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 31, 141.

1950 Structural birefringence in amorphous solids, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 31, 207.

1950 The lamellar structure and birerfingence of plate glass, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 31, 359.

1950 Crystals of quartz with iridescent faces, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 31, 275.

1950 The luminescence of diamond—I, *Curr. Sci.*, 19, 357.

1950 (With J. Jayaraman) The luninescence of diamond and its relation to crystal structure, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 32, 65.

1950 The iridescent feldspars, *Curr. Sci.*, 19, 301.

1950 (With A. Jayaraman) The sturcture of labradorite and the origin of its iridescence, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 32, 1.

1950 (With A. Jayaraman & T.K. Srinivasan) The structure and optical behaviour of

1950 Ceylon moonstones, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 32, 123.

1951 The luminescence of diamond—II, *Curr. Sci.*, 20, 1.

1951 The luminescence of diamond—III, *Curr. Sci.*, 20, 27.

1951 The luminescence of diamond—IV, *Curr. Sci.*, 20, 55.

1951 The scattering of light in crystals and the nature of their vibration spectra, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 34, 61.

1951 The vibration spectra of crystals and the theory of their specific heats, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 34, 141.

1951 *The new physics : talks on aspects of science*, Philisophical Library Inc., 15 East 40th Street, New York, N.Y.

1952 (With D. Krishnamurti) On the iridescence of potassium chlorate crystals, Part I : Its special characters, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 36, 315.

1952 (With D. Krishnamurti) On the iridescence of potassium chlorate crystals, Part II : Polarization effects, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 36, 321.

1952 (With D. Krishnamurti) On the iridescence of potassium chlorate crystals, Part III : Some general observations, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 36, 330.

1952 (With D. Krishnamurti) On the polarization of spectral character of the iridescence of potassium chlorate crystals, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 36, 419.

1953 (With M.R. Bhat) The Christiansen experiment, *Curr. Sci.*, 22, 31.

1953 (With D. Krishnamurti) The structure and optical behaviour of iridescent crystals of potassium chlorate, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 38, 261.

1953 (With A. Jayaraman) The diffusion haloes of the iridescent feldspars, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 37, 1.

1953 (With A. Jayaraman) The structure of opal and the origin of its iridescence, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 38, 101.

1953 (With A. Jayaraman) The structure and optical behaviour of iridescent agate, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 38, 199.

1953 (With A. Jayaraman) The structure and optical behaviour of iridescent opal, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 38, 343.

1954 (With A. Jayaraman) X-ray studies of polycrystalline gypsum, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 40, 57.

1954 (With A. Jayaraman) X-ray study of fibrous quartz, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 40, 107.

1954 (With D. Krishnamurti) Optics of the pearl, *Curr. Sci.*, 23, 173.

1954 Amethyst : its nature and origin, *Curr. Sci.*, 23, 379.

1954 (With D. Krishnamurti) The structure and optical behaviour of iridescent shells, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 39, 1.

1954 (With M.R. Bhat) The structure and optical behaviour of some synthetic fibres, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 39, 109.

1954 (With A. K. Ramdas) On the polycrystalline forms of gypsum and their optical behaviour, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 39, 153.

1954 (With D. Krishnamurti) The structure and optical behaviour of pearls, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 39, 215.

1954 (With D. Krishnamurti) On the chromatic diffusion halo and other optical effects exhibited by pearls, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 39, 265.

1954 (With A.K. Ramdas) The structure and optical behaviour of iridescent calcite, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 40, 1.

1954 (With A. Jayaraman) The structure of amethyst quartz and the origin of its pleochroism, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 40, 189.

1954	(With A. Jayaraman) On the structure of amethyst and its genesis in nature, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 40, 221.
1954	(With A. Jayaraman) On the the optical behaviour of cryptocrystalline quartz. *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 41, 1.
1955	(With K.S. Viswanathan) The theory of the propagation of light in polycrystalline media, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 41, 37.
1955	(With K.S. Viswanathan) A generalized theory of the Christiansen experiment, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 41, 55.
1955	(With M.R. Bhat) The Christiansen experiment with birefringent powders, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 41, 61.
1955	The nature of thermal agitation in crystals, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 42, 163.
1955	The elasticity of crystals, *Curr. Sci.*, 24, 325.
1955	The thermal energy of crystals, *Curr. Sci.*, 24, 357.
1955	X-rays and crystals, *Curr. Sci.*, 24, 395.
1955	(With A. Jayaraman) The structure and optical behaviour of jadeite, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 41, 117.
1955	(With K.S. Viswanathan) The elastic behaviour of isotropic solids, *Proc. Ind. Acad. Sci*, 42, 1.
1955	(With K.S. Viswanathan) On the theory of the elasticity of crystals, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 42, 51.
1955	(With D. Krishnamurti) Evaluation of the four elastic constants of some cubic crystals, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 42 (3), III.
1956	Quantum theory and crystal physics, *Curr. Sci.*, 25, 377.
1956	The birefringence patterns of crystal spheres, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 43, 1.
1956	The physics of crystals, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 43, 327.
1956	The specific heats of crystals, Part I : General theory, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 44, 153.
1956	The diamond, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 44, 99.
1956	The specific heats of crystals, Part II : The case of diamond, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 44, 160.
1956	Quantum theory and crystal physics, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 44, 361.
1956	The specific heats of crystals, Part III : Analysis of experimental data, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 44, 367.
1957	The specific heats of crystalline solids, Part I, *Curr. Sci.*, 26, 195.
1957	The specific heats of crystalline solids, Part II, *Curr. Sci.*, 26, 231.
1957	The specific heats of some metallic elements, Part I : Analysis of the experimental data, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 35, 1.
1957	The specific heats of some metallic elements, Part II : Approximate theoretical evaluation, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 45, 7.
1957	The specific heats of some metallic elements, Part III : The characteristic frequencies, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 45, 59.
1957	The specific heats of some metallic elements, Part IV : The residual spectrum, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 45, 139.

1957 The specific heats of crystals and the fallacy of the theories of Debye and Born, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 45, 273.

1957 The heat capacity of diamond between 0^0 and 1000^0K, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 46, 323.

1957 The tetrahedral carbon atom and the structure of diamond, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 46, 391.

1958 The diffraction of X-rays by diamond, Part I, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 47, 263.

1958 The diffraction of X-rays by diamond, Part II, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 47, 335.

1958 The diffraction of X-rays by diamond, Part III, *Proc. Ind Acad. Sci.*, 48, 1.

1958 Percussion figures in crystals, Proc. *Ind. Acad. Sci.*, 48, 307.

1958 Science in Eastern Europe, I. *Curr. Sci.*, 27, 371.

1958 Science in Eastern Europe, II. *Curr. Sci.*, 27, 421.

1959 Christian Huygens and the wave theory of light, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 49, 185.

1959 (With S. Pancharatnam) The optics of mirages, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 49, 251.

1959 The principle of Huygens and the diffraction of light, *Curr. Sci.*, 28, 267.

1959 Percussion figures in crystals, *Curr. Sci.*, 28, 1.

1959 Light, colour and vision, *Curr. Sci.*, 28, 429.

1959 *Lectures on physical optics*, Part I, The Indian Academy of sciences, Hebbal Post, Bangalore 6.

1960 The perception of light and colour and the physiology of vision, Part I : The mechanism of perception, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 52, 255.

1960 The perception of light and colour and the physiology of vision, Part II : The visual pigments, *Proc. Ind. Acad. Sci.*. 52, 267.

1960 The perception of light and colour and the physiology of vision, Part III : The carotenoid pigment, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 52. 281.

1960 The perception of light and colour and the physiology of vision, Part IV : Ferroheme and ferriheme, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 52, 292.

1960 The perception of light and colour and the physiology of vision, Part V : The colour triangle, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 52, 305.

1960 The perception of light and colour and the physiology of vision, Part VI : Defective colour vision, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 51, 314.

1960 The perception of light and colour and the physiology of vision, Part VII : General summary, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 52, 324.

1960 On the sensations of colour and the nature of the visual mechanism, *Curr. Sci.*, 29, 1.

1961 The vibrations of the MgO crystal structure and its infrared absorption spectrum, Part I : The results of experimental study, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 54, 205.

1961 The vibrations of the MgO crystal structure and its infrared absorption spectrum, Part II : Dynamical theory, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 54, 223.

1961 The vibrations of the MgO crystal structure and its infrared absorption spectrum, Part III : Comparison of theory and experiment, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 54, 233.

1961 The vibrations of the MgO crystal structure and its infrared absorption spectrum, Part IV : Evaluation of its specific heat, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 54, 244.

1961 The spectroscopic behaviour of rock-salt and the evaluation of its specific heat, Part I : The structure and its free vibrations, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 54, 253.

1961 The spectroscopic behaviour of rock-salt and the evaluation of its specific heat, Part II : Its infrared activity, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 54, 266.

1961 The spectroscopic behaviour of rock-salt and the evaluation of its specific heat, Part III : The spectrum of light scattering, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 54, 281.

1961 The spectroscopic behaviour of rock-salt and the evaluation of its specific heat, Part IV : Specific heat and spectral frequencies, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 54, 294.

1962 The luminescence of fluorspar, *Curr. Sci.*, 31, 361.

1962 The infra-red behaviour of diamond, *Curr. Sci.*, 31, 403.

1962 The two species of fiuorite, *Curr. Sci.*, 31, 445.

1962 The infrared absorption by diamond and its significance :

Part I Materials and methods, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 55, 1.

Part II A general survey of the results, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 55, 5.

Part III The perfect diamonds and their spectral behaviour, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 55, 10.

Part IV The non-luminescent diamonds, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 55, 14.

Part V The composite diamonds, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 55, 20.

Part VI The free vibrations of the structure, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 55, 24.

1962 Part VII The characteristic frequencies, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 55, 30.

Part VIII Dynamical theory, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 55, 36.

Part IX The activity of the natural modes , *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 55, 42.

Part X Evaluation of the specific heat, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 55, 49.

1962 The vibration spectrum of lithium fluoride and the evaluation of its specific heat, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 55, 131.

1962 The specific heats of alkali halides and their spectroscopic behaviour :

Part I Introduction, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 1.

Part II The free modes of atomic vibration, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 6.

Part III The interatomic forces, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 11.

Part IV The equations of motion, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 15.

Part V The evaluation of the frequencies, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 20.

Part VI The atomic vibration spectra, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 25.

Part VII Evaluation of the specific heats, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 30.

Part VIII Their infra-red activity, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 34.

Part IX Spectral shifts in light scattering, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 40.

Part X The lithium salts, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 45.

Part XI The sodium salts, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 52.

Part XII The potassium and rubidium salts, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 60.

1962 The infra-red behaviour of sodium fluoride, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 223.

1962 The dynamics of the fluorite structure and its infra-red behaviour :

Part I Introduction, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 291.
Part II The free modes of vibration, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 294.
Part III Activity of the normal modes, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 301.
Part IV The spectrophotometer records, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 56, 304.

1962 Spectroscopic evaluation of the specific heats of potassium bromide, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 57, 1.
1962 The role of the retina in vision, *Curr. Sci.*, 31, 315.
1962 Light, colour and vision, *Curr. Sci.*, 31, 489.
1963 The infra-red behaviour of the alkali halides, *Curr. Sci.*, 32, 1.
1963 Floral colours and their spectral composition, *Curr. Sci.*, 32, 147.
1963 The trichromatic hypothesis, *Curr. Sci.*, 32, 245.
1963 Floral colours and the physiology of vision, *Curr. Sci.*, 32, 293.
1963 The green colour of vegetation, *Curr. Sci.*, 32, 341.
1963 The visual pigments and their location in the retina, *Curr. Sci.*, 32, 389.
1963 The colours of gemstones, *Curr. Sci.*, 32, 437.
1963 Visual acuity and its variations, *Curr. Sci.*, 32, 531.
1963 Floral colours and the physiology of vision, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 58.

Part I Introductory, p.57.
Part II The green colour of leaves, p.62.
Part III The spectrum of the Morning Glory, p.67.
Part IV The queen of flowers, p.70.
Part V The blue of the Jacaranda, p.73.
Part VI Comparative study of three cases, p.76.
Part VII The Aster and its varied colours, p.81.
Part VIII The spectra of the roses, p.84.
Part IX Hibiscus and bougainvillaea, p.87.
Part X Flowers exhibiting band spectra, p.92.
Part XI Review of the results, p.96.
Part XII Some concluding remarks, p.106.

1964 Fluctuations of luminosity in visual fields, *Curr. Sci.*, 33, 65.
1964 Stars, nebulae and the physiology of vision, *Curr. Sci.*, 33, 293.
1964 The visual synthesis of colour, *Curr. Sci.*, 33, 97.
1964 The scintillation of the stars, *Curr. Sci.*, 33, 355.
1964 The new physiology of vision, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 60 :

Chapter I Introductory, p.139.
Chapter II Visual sensations and the nature of light, p.143.
Chapter III Corpuscles of light and the perception of luminosity, p.211.
Chapter IV Corpuscles of light and the perception of form, p.287.
Chapter V Corpuscles of light and the perception of colour, p.292.
1964 Chapter VI Vision in dim light, p. 369.
Chapter VII The perception of colour in dim light, p. 375.

1965 The new physiology of vision, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 61:

	Chapter VIII	The perception of polarized light, p.1.
	Chapter IX	The structure of the fovea, p.7.
	Chapter X	The major visual pigments, p.57.
	Chapter XI	The carotenoid pigments, p. 65.
	Chapter XII	Chromatic sensations at high luminosities, p.129.
	Chapter XIII	Blue, indigo and violet in the spectrum, p.133.
	Chapter XIV	The red end of the spectrum, p.187.
	Chapter XV	The chromatic responses of the retina, p. 193.
	Chapter XVI	Further studies of the retinal responses, p. 267.
	Chapter XVII	Location of visual pigments in the retina, p. 335.
	Chapter XVIII	The visual synthesis of colour, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 62, 1.
	Chapter XIX	Perception of colour and the trichromatic hypothesis, p.10.
	Chapter XX	Superposition and masking of colours, p.67.
	Chapter XXI	The green colour of vegetation, p.73.
	Chapter XXII	The colours of flowers, p.125.
	Chapter XXIII	The colours of roses, p.133.
	Chapter XXIV	Floral pigments and the perception of colour, p.177.
	Chapter XXV	The colours of natural and synthetic gemstones, p. 183.
	Chapter XXVI	Structural colours, p.237.
1965	Chapter XXVII	The colours of interference, p.243.
	Chapter XXVIII	Observations with a Neodymium filter, p.307.
	Chapter XXIX	The reproduction of colour, p.310.
	Chapter XXX	The photomechanical reproduction of colour, *Proc. Ind. Acad. Sci.*, 63, 1.
	Chapter XXXI	The integration of colour by the retina, p.5.
	Chapter XXXII	Defects in colour vision, p.65.
	Chapter XXXIII	The testing of colour vision, p.71.
	Chapter XXXIV	The nature and origin of defects in colour vision, p.133.
	Chapter XXXV	The faintest observable spectrum, p.138.
	Chapter XXXVI	The postulated duality of the retina, p.207.
	Chapter XXXVII	The spectrum of the night-sky, p.213.
	Chapter XXXVIII	The adaptation of vision to dim-light, p.263.
	Chapter XXXIX	Daltonian colour vision, p.267.
	Chapter XL	The colours of iolite, p.321.
	Chapter XLI	Photography in colour, p.325.
	Chapter XLII	Further observation with the Neodymium filter, p.329.
	Chapter XLIII	The colours of fluorspar, p.333.
1967	Zonal winds and jet streams in the atmosphere, *Curr. Sci.*, 66, 241.	
1968	The atmosphere of the Earth, *Curr. Sci.*, 67, 123.	

1968 *The physiology of vision.* The Indian Academy of Sciences Hebbal Post, Bangalore 6.

1969 Floral colours and their origin. *Curr. Sci.*, 38, 179.

1969 The florachromes : their constitution and optical behaviour, *Curr. Sci.*, 38, 451.

1969 The colours of roses, *Curr. Sci.*. 38, 503.

1969 Spectrophotometry of floral extracts, *Curr. Sci.*, 38, 527.

1969 Blue delphiniums and the purple bignonia, *Curr. Sci.*, 38, 553.

1969 The varied colours of verbena, *Curr. Sci.*, 38, 579.

1970 The pelargoniums, *Curr. Sci.*, 39, 1.

1970 The red oleander and the purple petrea, *Curr. Sci.*, 39, 25.

পরিশিষ্ট V

কয়েকটি নির্বাচিত পাঠ্যসূচী

রামন প্রভাবের সকল দিক নিয়ে কোন নিখুঁত তত্ত্ব আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। 1 নং পরিশিষ্টের শেষে বলা হয়েছে যে পুরানো কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে এর পুরো ব্যাখ্যা হয় না। এর জন্যে উচ্চস্তরের বাস্তবধর্মী কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার প্রয়োজন। কিন্তু অতি সরল পরমাণুর ক্ষেত্রেও সঠিক উত্তর কোয়ান্টাম বলবিদ্যা থেকে পাওয়া যায় না। পরমাণুৰ তুলনায় অণুর রামন প্রভাব আরও অনেক বেশি জটিল।

প্লাসজেক প্রথম কোয়ান্টাম বস্তুবিদ্যা অনুযায়ী একটি তত্ত্ব খাড়া করেন যা সনাতন কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি প্রতিরূপ। এর সাহয্যে রামন রেখার কম্পাংক ও তীব্রতার মান বেশ সন্তোষজনক ভাবেই মিলছিল। রামন নিজে কখনও তত্ত্ব তৈরি করার চেষ্টা করেন নি। রামন নিজে ছিলেন পরীক্ষাবিদ পদার্থবিদ এবং তত্ত্ব বা তত্ত্বীয় পদার্থবিদদের খুব একটা পছন্দ করতেন না। প্রভাবটি আবিষ্কার হবার পর যে সব প্রবন্ধ এ বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে তার একটি নির্বাচিত সূচী নিচে দেওয়া হল :

1. K. W. F. Kohlrausch : Der Smekal-Raman effekt, *Structur der Materie in Einzeldarstellungen, XII,* Julious Springer, 1931.
   একজন প্রথম শেণীর পদার্থবিদ দ্বারা জার্মানিতে প্রথম প্রকাশ।
2. P. Daure : Introduction a L'etude de l'effect Raman, *Edition dele revue o'ptique theorique et instrumenlalle,* 1933.
   একজন বিশিষ্ট সমসাময়িক পদার্থবিদ কর্তৃক ফরাসীতে প্রথম প্রকাশিত।
3. G. Placzek : Rayleigh-scattering und Raman effekt. *Handbuch der Radiologic* Vol. VI, Akadomishe verlagsgesellschaft, 1934.
   ধ্রুবণতার ধারণার ভিত্তিতে রামন প্রভাবের কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা সম্মত তত্ত্ব উপস্থাপনা করেন। রামন প্রভাবের তত্ত্ব হিসেবে এখন বহুল ব্যবহৃত।
4. G. B. B. M. Sutherland : *Infrared and Raman Spectra,* Methuen ,1935.
   তত্ত্ব ও পরীক্ষার ফলাফল সমন্বিত একটি ছোট মনোগ্রাফ ইংলণ্ডে প্রকাশিত।
5. J. H. Gibbon, *The Raman Effect and its Chemical Applications,* New York, 1939.
   আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রকাশিত প্রথম আমেরিকান বই। এতে বিষয়টির বিশদ আলোচনা আছে আর তার সঙ্গে জে. এইচ. গিবন ও এডয়ার্ড টেলারের তাত্ত্বিক আলোচনা।
6. S. Bhagavantam : *Scattering of light and the Raman Effect,* Andhra University, 1940.
   রামনের এক অতিশয় মেধাবী ছাত্র। রামনের লেখা ভূমিকা আছে। প্লাসজেকের তত্ত্বের একটি সরল ভাষ্য এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ফল দেওয়া আছে।
7. G. Glocker : The Raman Effect, *Review of Modern Physics,* 15, 1943.
   একটি রিভিউ প্রবন্ধ।

8. K. W. F. Kohlrausch : Ramanspektren. *Akademische Verlaggesellschaft*, Becker und Erler Kom.-Ges, Leipzig, 1943.
পঁচিশ বছরের পুরোনো হলেও এখনও এর ব্যবহার হয়। কয়েকশত জৈব যৌগের বর্ণালি আছে; স্মেকালের নাম বাদ।

9. G. Herzburg : *Infrared and Raman Spectra*, Van Nostrand, 1945.
বিস্তারিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। জ্যাক লোডার বলেন যে কম্পন নিয়ে বর্ণালিবিদরা কাজ করেন এটি তাদের বাইবেল।

10. S. I. Mizushima : Raman Effect, *Handbuch der Physik*, Vol. 26, 1958.
সমসাময়িক ডাটাপূর্ণ উচ্চশ্রেণীর রচনা।

11. J. Brandmuller and H. Moser : *Einfuhrung in die Raman Spektroskopie,* Dietrich Stein Kopff Verlag, Darmstadt, 1962.
তত্ত্ব, যন্ত্রপাতি ও তথ্য বিষয়ে আজ পর্যন্ত না কাজ হয়েছে তার সমালোচনা।

12. H. A. Szymanski, ed. : *Raman Spectroscopy*. Plenum Press, New York, 1967.
রামন বর্ণালি বিদ্যায় যারা কাজ করেন এমন আটজন প্রথম সারির বিজ্ঞানীর লেখা আটটি প্রবন্ধ।

13. J. Loader : *Basic Laser Raman Spectroscopy*, Hyden & Son Ltd., London, 1970.
লেসার ব্যবহার করে রামন বর্ণালিবিদ্যার গবেষণাক্ষেত্র যে প্রসারিত হয়েছে তার বিষয়ে চমৎকার ভূমিকা। অনেক পরিষ্কার বর্ণালিচিত্র দেওয়া আছে।

14. A. Anderson. ed. : *The Raman Effect,* in two volumes, Marcel Dekkar, New York, 1971.
প্রথম খণ্ডে সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে নানা প্রয়োগের কথা সবশুদ্ধ এগারোটি প্রবন্ধ, লিখেছেন এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা। তার মধ্যে আছেন রামনের প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক আর. এস. কৃষ্ণান।

15. R. E. Hester and J. H. R. Clarke, *Raman Spectroscopy,* W. A. Benzamin, New York, 1973.
বিষয়টির সামগ্রিক আলোচনা পাওয়া যাবে।

16. D. A. Long, *Raman Spectroscopy*, McGraw-Hill Int. Book Co., 1977.
তত্ত্ব, ননলিনিয়ার প্রভাব বর্ণনায় এবং অনেক পরিশীলিত প্রয়োগ নিদর্শনে সমৃদ্ধ অতি চমৎকার বই।

রামনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

1884	নভেম্বর 7	তামিল নাড়ুর (পুরাতন মাদ্রাজের) তিরুচিরাপল্লী (পুরাতন ত্রিচিনাপলি)-তে জন্ম।
1900		বিশাখাপত্তনমের হিন্দু হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ।
1902		বিশাখাপত্তনমের হিন্দু কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ।
1903		মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি।
1905		16 বছর বয়সে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. ডিগ্রি লাভ। ফিজিক্সে বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক সহ এলফিনস্টোন মেডাল ও জাগীরদার মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক লাভ।
1906		18 বছর বয়সে ইংল্যাণ্ডের ফিলজফিকাল ম্যাগাজিনে প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ।
1907		ইণ্ডিয়ান ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে নির্বাচিত।
		নিজের পছন্দে লোকসুন্দরীকে বিবাহ।
		অ্যাসিস্টান্ট একাউন্টেন্ট জেনারল হিসেবে কলকাতায় নিয়োগ।
		ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অফ সায়েন্সে গবেষণা শুরু।
1910		রেঙ্গুনে বদলি। বাবার অসুখের জন্য কিছুদিন ছুটিতে কাটানোর পর নাগপুরে স্থানান্তরিত।
1911		উন্নীত পদে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।
1912		গবেষণায় কার্জন পুরস্কার লাভ।
1913		আশুতোষ মুখার্জির প্রচেষ্টায় পালিত বোর্ড কর্তৃক রামনকে ফিজিক্সে পালিত অধ্যাপক পদে আহ্বান। রামনের বয়স তখন 25 ।
		ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে ফিজিক্স শাখার সভাপতি। উডবার্ন পদক লাভ।
1914		মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা।
1917		ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট ত্যাগ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত অধ্যাপক হিসেবে যোগদান।
1919		ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্সের সেক্রেটারী নির্বাচিত।
1921		অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেলিগেট হিসেবে যোগদান।
		জে. জে. থমসন, রাদারফোর্ড প্রভৃতি ব্রিটিশ পদার্থবিদদের সঙ্গে আলাপ।

		আলোর বিক্ষেপণ নিয়ে কাজ শুরু।
		কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারী ডি. এস. সি. ডিগ্রী লাভ।
1922		মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রিত অধ্যাপক।
1923		ছাত্র রামনাথন আলোর কম্পাংকের (রঙের) পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। এর কারণ তখন বোঝা যায়নি।
1924		কানাডা গমন। টরন্টোতে আলোর বিক্ষেপণ বিষয়ে সম্মেলন উদ্বোধন।
		ফিলডেলফিয়াতে ফ্রাংকলিন শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান।
		লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য পদলাভ।
		ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্সের প্রবর্তন ও সম্পাদনা।
1924-25		অধ্যাপক আর. এ. মিলিকানের আমন্ত্রণে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিতে ভিজিটিং অধ্যাপক।
1925		রাশিয়ার সায়েন্স অ্যাকাডেমির আমন্ত্রণে অ্যাকাডেমির দ্বিশতবর্ষপূর্তি উৎসবে যোগদান।
1926		বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ।
1927		বিশেষ আমন্ত্রণে হ্যাণ্ডবুক ডার ফিজিকে 155 পৃষ্ঠার প্রবন্ধে 'ম্যুজিক ইন্সট্রুমেন্টে উণ্ড ইহ্‌র ক্লাঙ্গে' প্রকাশ।
1928	ফেব্রুয়ারী 16	লণ্ডনের নেচার পত্রিকায় কে. এস. কৃষ্ণানের সঙ্গে যুগ্মভাবে লেখা পত্র—একটি নতুন প্রভাবের (পরে যার নাম রামন প্রভাব হয়) আবিষ্কার পাঠান। 1928 সালে 31 মার্চ সেটি ছাপা হয়।
1928	ফেব্রুয়ারী 28	আবিষ্কারের কথা রামন জনসাধারনের কাছে ঘোষণা করেন।
	মার্চ 8	শুধু নিজের নামে নেচারে আর একটি চিঠি পাঠান।
	মার্চ 16	বাঙ্গালোরে সাউথ ইণ্ডিয়ান সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে 'নতুন বিকিরণ' নামে বক্তৃতা। (এটি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্সের এপ্রিল-মে সংখ্যায় ছাপা হয়)। কলকাতা ফেরার পর রাতারাতি ছেপে হাজার হাজার কপি বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে 31.3.1928 সালে পাঠানো হয়।
	মার্চ 22	কৃষ্ণানের সঙ্গে যুগ্মভাবে লিখিত এই নতুন আবিষ্কার বিষয়ে আর একটি চিঠি নেচার পত্রিকায় প্রেরণ। স্থানচ্যুত রামন লেখা সম্বলিত বর্ণালি ছত্রের প্রথম প্রকাশ।
	মে 7	ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্সে প্রকাশের জন্য কৃষ্ণানের সঙ্গে যুগ্মভাবে লিখিত নতুন আবিষ্কার বিষয়ে গবেষণাপত্র জমা পড়ে।
	আগস্ট 7	কৃষ্ণানের সহযোগিতায় লেখা একটি দীর্ঘ গবেষণাপত্র প্রোসিডিংস অফ দি রয়্যাল সোসাইটি অফ লণ্ডনে প্রকাশের জন্য প্রেরণ। জানুয়ারী 1929-এ প্রকাশিত।
		ইটালিয়ান সোসাইটি অফ সায়েন্স কর্তৃক মাটেউস্কি পদক দান।
1929	জুন 3	ইংল্যাণ্ডেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ দ্বারা নাইট উপাধি দান।
		ফারাডে সোসাইটি কর্তৃক ব্রিস্টলে অনুষ্ঠিত আণবিক বর্ণচ্ছত্র ও গঠন বিষয়ে আলোচনা চক্র উদ্বোধনের আমন্ত্রণ।

	ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি ফ্রিবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক পি. এইচ. ডি লাভ।
	জুরিখ ফিজিকাল সোসাইটির অনারারী সদস্যপদ লাভ।
	রয়্যাল সোসাইটি অফ লণ্ডনের হিউজেস পদক দান।
1930	ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার লাভ।
1932	প্যারি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা সম্মানসূচক ডি. এস. সি. ডিগ্রি দান।
1933	বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টার হিসেবে যোগ দিতে কলকাতা ত্যাগ—প্রায় বিনা আড়ম্বরে।
1934	1934 সালের 24 এপ্রিল ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সের প্রতিষ্ঠা।
1935	গবেষণাগার স্থাপনের জন্য মহীশূরের মহারাজার রামনকে জমি দান।
	ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন বম্বেতে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে বিজ্ঞান প্রচার ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সৃষ্টির জন্য জামশেদজি টাটার প্রশংসা করেন।
1936	মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাত। (রামন গান্ধী ও ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।)
1937	ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিরেক্টার পদ ছেড়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিতে বাধ্য করা হয়।
	ইউরোপে পদার্থবিদ্যার আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগ দেন।
1941	ফিলাডেলফিয়ার ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউট থেকে ফ্রাঙ্কলিন পদক লাভ।
	হীরা ভৌতধর্ম বিষয়ে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা।
	ভৌত আলোক-বিজ্ঞান বিষয়ে গায়েকোয়ার ফাউণ্ডেশান বক্তৃতা দান। এটি 1959 সালে প্রকাশিত হয়।
1948	ফ্রান্সের বোর্ডোতে অনুষ্ঠিত "Diffusion Moleculaire de la Lumiere et la Effect Raman" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান ও সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি লাভ।
	আমেরিকার হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কেলাসতত্ত্ব নিয়ে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগদান।
1949	একষট্টি বছর বয়সে বাঙ্গালোরে রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভার গ্রহণ।
	ভারত সরকার দ্বারা প্রথম জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার সম্মান।
	গাণিতশাস্ত্রবিদ জি. এইচ. হার্ডির পর ফরেন অ্যাসোসিয়েট হিসেবে অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস অফ ফ্রান্স নির্বাচন।
1951	বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বিষয়ে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করেন। শেষ বয়সে রামন আবহতত্ত্বে বিশেষ মনোযোগী হন। তাঁর অনেক প্রাক্তন ছাত্র ভারত সরকারের আবহবিদ্যা বিষয়ক দপ্তরে কাজ করতেন। ভারত সরকারের এই দপ্তরটিতে পদার্থবিদদের কাজ পাবার সুযোগ ছিল।
1954	প্রজাতন্ত্র দিবসে শ্রেষ্ঠ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধি লাভ।
1957	আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার পান।

	সোভিয়েত অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স কর্তৃক বিদেশী সভ্য নির্বাচিত।
1961	ত্রয়োবিংশতিতম পোপ জন কর্তৃক পণ্টিফিকাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের সদস্য নিয়োগ।
1964	দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. এস. সি. ডিগ্রি লাভ।
1959-67	দৃষ্টির শারীরতত্ব নিয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ—পুস্তকাকারে 1968 সালে প্রকাশিত। রামন নিজে মনে করলেও এটাকে খুব একটা বড় কাজ বলা যায় না।
1968	লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ ত্যাগ। 44 বছর বয়সে এই পদে ছিলেন।
1970	বাঙ্গালোরে নিজ আবাসে 21 নভেম্বর ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন বয়স 82 বছর। রেখে গেলেন স্ত্রী ও দুই পুত্র। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী রামন ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গনে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

পরিশিষ্ট VII

বিংশ অধ্যায়—বিতর্ক বিষয়ে টীকা

তরলের বিক্ষেপণে যে আলো দেখা যায় রামন গোষ্ঠীর সবাই তাকে প্রতিপ্রভা মনে করতেন। কে. এস. কৃষ্ণান তা কোনদিন মানতেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি এই নতুন প্রতিভায় ধ্রুবণের উপস্থিতি প্রমাণ করে তাদের মুখবন্ধ করেন। কিন্তু উৎসাহ ও নির্দেশ আসত রামনের কাছ থেকেই। বাস্তবিক পক্ষে রামনই প্রথম বুঝতে পারেন যে এই প্রভাবটির কথাই ক্রামার হাইসেবার্গ 1925 সালে তত্ত্বের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কৃষ্ণান ডায়েরি লিখতেন, তার কিছু অংশ নিচে দেওয়া হ'ল।[1]

7 ফেব্রুয়ারী (1928), মঙ্গলবার

অ্যারোমেটিক তরলে অতি বেগুনির কাছাকাছি আলো থেকে প্রতিপ্রভায় যে ধ্রুবণ দেখেছিলাম সেটা আবার পরীক্ষা করলাম। প্রসঙ্গত, আবিষ্কার করেছি সব বিশুদ্ধ তরল থেকেই মোটামুটি তীব্র প্রতিপ্রভা দেখায় দৃশ্য আলোর পাল্লার মধ্যেই, আর সব থেকে মজার কথা হলো সবগুলিই অতিমাত্রায় ধ্রুবিত।

ফলগুলির কথা প্রফেসারকে (রামনকে) বললাম, উনি বিশ্বাসই করলেন না যে সব তরল দৃশ্যপাল্লায় ধ্রুবিত প্রতিপ্রভা দেখাতে পারে। উনি যখন ঘরে ঢুকলেন তখন পেণ্টেন ভর্তি একটি কাচের বাল্ব আমি টাঙ্কে রাখলাম, আর একটি নীল-বেগুনি ফিলটার আপতিত আলোর উপর ধরলাম। একটি নীল হলদে ফিলটারের মধ্যে দিয়ে যখন উনি ট্রাক দেখতে পেলেন, বলে উঠলেন—"তুমি বলছ এর সবটাই প্রতিভায়! কৃষ্ণান, এ কি সম্ভব," তারপর সবুজ-হলদে ফিলটারটি সরিয়ে আপতিত রশ্মিতে ধরলেন—ট্রাকের চিহ্নমাত্র রইল না। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং বার বার বলতে লাগলেন এ এক আশ্চর্য রেজাল্ট। একটি একটি করে সারিবদ্ধ সব তরল পরীক্ষা করা হল, প্রত্যেকটিতে প্রভাব বর্তমান কোন ব্যতিক্রম নেই। তিনি অবাক হয়ে বললেন পাঁচ বছর আগে আমরা কেন দেখতে পাইনি।

অপরাহ্নে প্রতিপ্রভার ধ্রুবণের কিছু মাপ জোক করলাম।

রাতে খাবার খাওয়ার পর ভেঙ্কটেশ্বরন ও আমি আমাদের ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম, হঠাৎ প্রফেসর আমাদের বাড়ীর দরজায় এসে আমার নাম ধরে ডাকলেন (তখন রাত 9 টা)। আমরা নিচে এসে দেখি উনি বিশেষ উত্তেজিত এবং আমাকে এ কথা বলতে এসেছেন যে সকালে আমরা যা দেখেছি তা নিশ্চয়ই ক্রামার হাইসেনবার্গ প্রভাব, যা আমরা এতদিন ধরে খুঁজছি। সুতরাং আমরা ঠিক করলাম যে প্রভাবটিকে আমরা "পরিবর্তিত বিক্ষেপণ" বলব। আমরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় সওয়া ঘণ্টা কথাবার্তা বলেছিলাম এবং উনি বারবার আবিষ্কারটির গুরুত্বের কথা বলেছিলেন।

9 ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার

প্রফেসার যখন কলেজ থেকে তিনটের সময় ফিরলেন, আমি গ্যাসে দেখা রেজাল্টগুলোর কথা বললাম।

---

[1] আর. এস. কৃষ্ণান: কে. এস. কৃষ্ণান স্মারক বক্তৃতা, 4 ডিসেম্বর, 1978, ন্যাশনাল ফিজিকাল ল্যাবরেটরী, নিউ দিল্লি। এই দুই কৃষ্ণানের মধ্যে কোন আত্মীয়তা ছিল না।

তখনও যথেষ্ট সূর্যের আলো পাওয়া যাচ্ছিল। প্রফেসর বললেন এটা একটা প্রথম শ্রেণীর আবিষ্কার, অথচ এক্সপেরিমেণ্ট ছেড়ে গিয়ে ক্লাসে পড়াতে তার ভীষণ খারাপ লাগছিল। অবশ্য তিনি এটা নিশ্চিত ছিলেন যে গ্যাসে এই প্রভাব আবিষ্কার না করা পর্যন্ত আমি ঠিকই লেগে থাকব (পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দেবো না)।

বিকেলটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। বেড়ানোর পর ফিরে এসে বললেন, ভবিষ্যতে আমাকে এই ধরনের শক্ত শক্ত সমস্যার মোকবিলা করতে হবে এবং এই কাজ শেষ হবার পর আমাকে ইলেকট্রনের স্পিন আছে এটা এক্সপেরিমেণ্ট করে প্রমাণ করতে হবে।

17 ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার

পেণ্টেল বাষ্পের প্রতিপ্রভায় ধ্রুবণ প্রফেসার দেখে স্বীকার করেছেন। আমার বাঁ চোখে বেশ ব্যাথা হয়েছে। প্রফেসর রাজি হয়েছেন কিছুদিন কাজগুলো উনি নিজেই দেখবেন।

('পরিবর্তিত বিক্ষেপণ' বর্ণনাটি 'নতুন বিকিরণ' থেকে অনেক যুক্তিযুক্ত)।

এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে আবিষ্কারের পরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত রামনের বিশ্বাস ছিল যে বিক্ষিপ্ত বিকিরণের কম্পাংক বিকিরণ বস্তুর ধর্মের উপর নির্ভর করে না। 1928 সালের 8 মার্চ নেচারে প্রকাশিত রামনের একার নামে লেখা চিঠিতে সে কথাই বলা আছে। 28 ফেব্রুয়ারী 1928 সালে রামন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। সেই খবর পরিবেশন করে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া 29 ফেব্রুয়ারী ছাপেন : "সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে পরিবর্তিত রং বস্তুর গুণাগুণের উপর একেবারেই নির্ভর করে না।"[2]

এটি শুদ্ধ করা হয় রামন ও কৃষ্ণানের যুগ্মভাবে লিখিত তৃতীয় পত্রে 22 মার্চ 1928 নেচারে প্রকাশিত।

[2] এস রামশেষণ; কারেন্ট সায়েন্স, 47, 128 (1978)